স্মরণিকা
২০১০







বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়



স্মরণিকা ২০১০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইং
ছফর ১৪৩১ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৬ বাং।

উপদেষ্টা
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রধান সম্পাদক
ইমামুদ্দীন

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ

কম্পোজ
জিয়াউর রহমান, গোলাম কিবরিয়া
ও সাদীক মাহমুদ।

অঙ্গসজ্জা
আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

শুভেচ্ছা মূল্য
২০ টাকা।

মুদ্রণ

প্রকাশক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সর্বোচ্চ জ্ঞানকেন্দ্র। মধুময় ফুলের বাগানে মৌমাছি যেমন মহা উৎফুল্লে মধু সংগ্রহের জন্য আগমন করে তেমনি প্রতিভার খোরাক অন্বেষণে ছাত্ররা ছুটে আসে বিশ্ববিদ্যালয় পানে। কিন্তু মধু সংগ্রহরত মৌমাছিকে হত্যা করা হলে, বাধার ফাঁদ পেতে রাখা হলে মানুষ যেমন মধুর সন্ধান পাবে না, তেমনি শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের প্রাণ ঝরে পড়লে, জ্ঞান আহরণে বাধাগ্রস্ত হ'লে, শিক্ষার পরিবেশ প্রতিকূল হলে সমগ্র জাতি জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত হবে; অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসীদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে, তারা সেখানে কায়েম করেছে ত্রাসের রাজ্য। একটি গাঁয়ের ছেলে ছায়াঘেরা, মায়াভরা গ্রামীণ ভালবাসা ও পিতা-মাতার অবর্ণনীয় স্নেহ-মায়া-মমতার হাতছানিকে পিছনে ফেলে, বিপদসংকুল শত বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে, দারিদ্র্যের কষাঘাতকে পদদলিত করে, হৃদয়তন্ত্রীতে হাযারো ব্যথা-বেদনাকে পাথর চাপা দিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটে আসে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! এখানে এসে হল দখল, আধিপত্য বিস্তার ও প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতির হিংস্র ছোবলে বিলীন হয়ে যায় তার হৃদয়ের সকল স্বপ্নসাধ। দেশের রত্ন হয়ে গাঁয়ে ফেরার কথা থাকলেও ফিরে যায় কফিনে শায়িত লাশ হয়ে। সন্তানের কৃতিত্বে পিতা-মাতা ও স্বজনদের চেহারার হাসির অনন্য স্রোত প্রবাহিত হওয়ার কথা থাকলেও তাদের দু'চোখ বেয়ে প্রবাহিত হয় অব্যক্ত বেদনার অপ্রতিরোধ্য অশ্রুধারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর কত যে মেধাবী ছাত্রের তরতাজা লহুতে রঞ্জিত হয়েছে কে রাখে তার খবর? কে করবে এদের স্বপ্ন-সাধের মূল্যায়ন? আর কত তাজা প্রাণ এভাবে ঝরে পড়বে? আর কত কাল চোখ মুদে ঘুমাতে হবে? কবে হবে এ ভঙ্গুর পরিবেশের উত্তরণ? সময় এসেছে ভাববার। এ শিক্ষা কি জাতিকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিতে পারে?

উক্ত অবস্থার জন্য দায়ী বিভক্ত রাজনীতি ও ছাত্রদের দলীয় লেজুড়বৃত্তি। বিশেষ করে বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা। কারণ যে শিক্ষা নৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে না সেটা কোন শিক্ষাই নয়। এই শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। অথচ শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যই হ'ল নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো। যেমন ইসলামের প্রথম বাণীই হ'ল 'পড়, তোমার প্রভুর নামে' *(আলাক্ব-১)*। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কবি মিল্টন বলেন, 'Education is harmonious development of body, mind and soul' 'শিক্ষা হ'ল শরীর, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের নাম'। সক্রেটিস বলেন, 'নিজেকে জানার নাম শিক্ষা'। আল্লামা ইকবাল বলেন, 'মানুষের খুদির উন্নয়নই আসল শিক্ষা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, 'মানুষের ভিতরের আসল মানুষটির পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানাবার প্রচেষ্টার নাম শিক্ষা'। আর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ প্রবাদ হ'ল 'সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। লক্ষণীয় হ'ল, ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই শিক্ষা বলতে নৈতিক উন্নয়ন ও মনুষ্যত্বের বিকাশকেই বুঝিয়েছে। যার পরশে মানুষ হবে সর্বোত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতীক; তরুণ ছাত্র সমাজ হবে ভবিষ্যৎ কর্ণধর।

অতএব দেশ, জাতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ বেহাল দশার উন্নয়নে সকল তরুণ ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে অহিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ও চির অম্লান আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিকে। খুঁজে বের করতে হবে মুক্তির সেই পথ। আর সেই পথই হ'ল অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস অহি-র পথ, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পথ। **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** তরুণ ছাত্র সমাজকে সেই তাওহীদী প্লাটফরমের দিকেই আহ্বান জানায়।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর জাতীয় তাবলীগী ইজতেমা ২০১০-এর পূর্বমুহূর্তে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মত 'স্মরণিকা ২০১০' প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ফালিল্লা-হিল হামদ। যারা এ স্মরণিকা প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। এই স্মরণিকা যেন আগামী দিনে রাবি 'যুবসংঘে'র জন্য মাইল ফলক হিসাবে কাজ করে এই প্রার্থনাই আল্লাহ তা'আলার দরবারে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই প্রার্থনা কবুল করুন- আমীন!!!

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

অতীতে কৃত, ভবিষ্যতে করণীয় এবং বর্তমানের কর্মতৎপরতা সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেওয়াই হ'ল কোন স্মরণিকা প্রকাশের মূল লক্ষ্য। ১৯৭৮ সালের মে মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার চলতি সেশনের কর্মপরিষদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম **স্মরণিকা** প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে জেনে আমরা প্রথমে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি এবং দায়িত্বশীল তরুণদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ক্ষমতার কাঙালদের হিংস্র ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত বিশ্ববিদ্যালয়ের হত-বিহ্বল ছাত্রদের নিকট আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার দৃঢ় শপথ নিয়ে আগুয়ান **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাক এই দো'আ করি। সাথে সাথে স্মরণিকার সাহিত্যাংগনে নবাগত তরুণদেরকে আগামী দিনের কলমী জিহাদের অগ্রসৈনিক হয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসের অভিসারী হওয়ার আহ্বান জানাই।

(স্বাক্ষর)

(প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)
আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

কেন্দ্রীয় সভাপতি

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথমবারের মত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। এই মহতি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমরা তাদেরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেই দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। এখান থেকেই বেরিয়ে আসে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব, জাতির যোগ্যতম সেবক। একথা সর্বজন বিদিত যে, সুশিক্ষা যেমন ব্যক্তিকে পরিশীলিত করে, নৈতিকতার আদর্শে উজ্জীবিত করে; তেমনি সমাজ, দেশ ও জাতিকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ধাবিত করে। পক্ষান্তরে কুশিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতি সবার জন্য অকল্যাণ ও অমঙ্গল বয়ে আনে। বর্তমানে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশিক্ষা অর্জনের পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমের পরিবর্তে শোভা পায় আগ্নেয়াস্ত্র। পরীক্ষায় ভাল করার প্রতিযোগিতার স্থলে দেখা যায় হল দখলের মহড়া ও প্রচেষ্টা। মসির পরিবর্তে অসিই এখন তাদের কাছে অতি প্রিয়। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর এই স্মরণিকা শিক্ষার্থীদেরকে মসির দিকে ফিরে আসার পথ দেখাবে, সুশিক্ষা অর্জনের দিকে জোর আহ্বান জানাবে, আদর্শ ও দেশ প্রেমিক নাগরিক হওয়ার পথ বাতলে দেবে ইনশাআল্লাহ।

দেশে সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতির সয়লাব চলছে, সাহিত্যের নামে যে পর্ণ সাহিত্যের জয়জয়কার চলছে, তার মুকাবিলায় সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও সুসাহিত্য সৃষ্টিতে এ স্মরণিকা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। সুসাহিত্য সৃষ্টির পূর্বশর্ত সুস্থ মানসিকতা ও উত্তম নৈতিকতা সম্পন্ন কলম সৈনিক তৈরী করা। আল্লাহর ইচ্ছায় সেক্ষেত্রেও এ স্মরণিকা দিশারীর ভূমিকা পালন করবে।

যারা এই উদ্যোগ নিয়েছে এবং একে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন- আমীন!

(ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম)
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

সভাপতি

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

কোন ইতিহাস ঐতিহ্যকে স্মরণ করে রাখার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে 'স্মরণিকা'। একবিংশ শতাব্দীর যুগ সন্ধিক্ষণে যখন দেশরত্ন ছাত্রসমাজ অপসংস্কৃতির চোরাবালিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে; তথ্য সন্ত্রাস, মাদকতা, হল দখল ও আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতির বিষাক্ত ফাঁদে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ মতিহারের সবুজ চত্বর কলুষিত; কোমলমতি ছাত্রসমাজ এ মরণফাঁদ থেকে বাঁচার আশায় হন্যে হয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছে। ঠিক এমন নাজুক পরিস্থিতিতে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সত্য-ন্যায়ের পথ দেখানোর মানসে স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরে বর্তমান সেশনের সভাপতি হিসাবে গর্ববোধ করছি এবং মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি আমি আশাবাদী যে এর মাধ্যমেই একাধিক কলম সৈনিকের আবির্ভাব ঘটবে। ভবিষ্যতে যারা ক্ষুরধার লেখনীর দ্বারা পথভোলা মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। সাথে সাথে অনাগত এপথের পথিকদের সাংগঠনিক কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে ইনশাআল্লাহ।

এ স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মহান আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন এই কামনায়-

(ইমামুদ্দীন)
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাবেক সভাপতিদের বাণী

বাণী

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ

১৯৭৮ সাল। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম. এ শেষ বর্ষের ছাত্র। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম. এ শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন। ঐ বছরের ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার তিনি নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** প্রতিষ্ঠা করেন এবং সে বছরের মে মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমাকে আহবায়ক করে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাবি শাখা কর্মপরিষদ গঠন করেন। অথচ জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ হওয়া সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত আমি আহলেহাদীছ কী, কেন বা তার পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। সেদিনই সর্বপ্রথম তাঁর নিকট হতে আহলেহাদীছদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হই। তারপর হতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যুবসংঘের কার্যক্রম বেগবান করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করি। তখন থেকে অদ্যাবধি রাবিতে যুবসংঘের কর্মতৎপরতা হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলেছে। চলতি সেশনের কর্মপরিষদের তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সাথে সাথে তাদের এ মহতী প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা বিশ্বে যুবসংঘের স্বরূপ ও কর্মতৎপরতার বিস্তার ঘটুক, আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করছি।

মোঃ ইউনুসুর রহমান
সহকারী মৌলভী,
শহীদ নাজমুল হক উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী।

বাণী

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

১৯৯২-৯৩ সেশনে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির দায়িত্ব পালন কালে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত ক্যাম্পাসের ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, জোহা হল ও মাদারবখ্‌শ হল সহ বিভিন্ন স্থানে সাংগঠনিক প্রোগ্রাম করতাম। বহুদিন পরে সেই ক্ষুদ্র কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করতে পেরে এবং **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্তমান কর্মপরিষদের উদ্যোগে **'স্মরণিকা'** প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সাথে সাথে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সাহেবের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করতঃ এই সংগ্রামী পদক্ষেপ গ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। আমীন!

রফিকুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
ফতিয়ার রহমান মহিলা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।

বাণী

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

১৯৭৮ ইং সালে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** প্রতিষ্ঠাত্তোর যুবসংঘের, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগে স্মরণিকা প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মতিহারের সবুজ চত্বরে **'যুবসংঘ'**-এর সংগ্রামী দীপ্তিমান পদচারণার খণ্ডিত ইতিহাস যা কখনও কন্টকাকীর্ণ কখনও বা বর্ণিল, তা প্রকাশিত হ'লে কেবল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝেই নয়; বরং দেশ-বিদেশ যুবসংঘের সকল কর্মীর অন্তরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় মনের মাঝে আশা-উদ্দীপনার এক নব আলোকবর্তিকার জোয়ার সৃষ্টি করবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই শুভ মুহূর্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের তৎপরতা বিশেষতঃ বর্তমান সেশনের সভাপতি স্নেহাস্পদ ইমামুদ্দীনের ঐকান্তিক আগ্রহের কথা আমাকে স্মরণ করতে হয়। আশা করছি এই স্মরণিকা শুধু ইতিহাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে না হয়ে দেশের ছাত্রসমাজকে সঠিক দিকে অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর কাফেলায় সমবেত হয়ে সংগ্রামী এই জীবনের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!!

শামসুল আলম
সহকারী শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

বাণী

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

অহির বিধান কায়েমের মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে হলে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও নির্ভেজাল আমল প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে অহির দা'ওয়াত-এর কাজ করার জন্য হেকমতের সাথে এগিয়ে চলেছে। আজকে এই স্মরণিকা তারই ফসল। এর মাধ্যমে যুবসমাজ আরো একধাপ এগিয়ে যাবে বলে আমি একান্ত আশাবাদী।

বর্তমান সেশনের সকলকে স্মরণিকা প্রকাশের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে দো'আ করি আল্লাহ যেন এমনিভাবে যুবকদের সুপরিকল্পিতভাবে ভালো ভালো কাজ করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

এস. এম হাবীবুল্লাহ
প্রভাষক
আহসানী ডিগ্রী কলেজ
সাতক্ষীরা

বাণী

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় -এর উদ্যোগে প্রথমবারের মত একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি। স্নেহমাখা শুকরিয়া জানাচ্ছি বর্তমান কর্মপরিষদকে। দো'আ করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বৃহৎ অঙ্গনে নির্ভেজাল দ্বীনী সংগঠন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতির। কেননা ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও প্রচলিত দলবাজির নোংরা ড্রেন থেকে জাতির কাণ্ডারী ও ভবিষ্যত প্রজন্মখ্যাত ছাত্রদেরকে উদ্ধার করে আখেরাতমুখী করে গড়ে তোলার নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করতে পারে একমাত্র যুবসংঘই। নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এ সংগঠনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরাই পারে মানবজাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয় সর্বশেষ বিধিমালা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে কোমলমতি ছাত্রদেরকে জমায়েত করতে। তাই তো এই সংগঠনের জগৎ কাঁপানো শ্লোগান হচ্ছে 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। তাদেরই নিয়মিত দা'ওয়াতী কার্যক্রমের স্বাক্ষর এই স্মরণিকা। জ্ঞানার্জনের সর্বোচ্চ পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বৃহত্তর অঙ্গনে এক ঝাঁক যুবক ও তরুণের অহি-র বিধান অনুযায়ী জীবন গড়ার আহ্বান সম্বলিত এই স্মরণিকা আগামী প্রজন্মের জন্য নতুন প্রত্যাশা ও উৎসাহ বার্তা হিসাবে কাজ করবে বলে আশা রাখি। সেই সাথে এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর অধিকতর শক্তিশালী একটি দা'ওয়াতী প্লাটফরম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এটিই আমার একান্ত কামনা। পরিশেষে এই স্মরণিকার লেখক, প্রকাশক, উদ্যোক্তা এবং সহযোগী সকলকে মহান আল্লাহ তা'আলা উত্তম পারিতোষিক দান করুন-আমীন!!

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক।

বাণী

বাংলাদেশের সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত যেলা রাজশাহীতে মতিহারের সবুজ চত্বরে প্রতিষ্ঠিত উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এ মহানগরেই স্থাপিত প্রাণপ্রিয় সংগঠন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** কেন্দ্রীয় কার্যালয়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধিকাংশই আসে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আহলেহাদীছ যুবসংঘ থেকে। ইতিমধ্যে সংগঠনটি প্রায় তিন যুগ পূর্ণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু অস্ত্র নির্ভর ছাত্র সংগঠন সমূহের কারণে মতিহারের সবুজ চত্বর আজ রক্তাক্ত অঙ্গনে পরিণত হয়েছে। প্রথমবারের মত **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান সেশনের স্নেহাস্পদ দায়িত্বশীল কর্মী ও সাথীবৃন্দ স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে আলোকজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ স্মরণিকা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করবে। মেধাবী তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল ও মননশীল কর্ম তৎপরভাবে গতিশীল করবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পাদনা পরিষদ, লেখক ও অন্যান্যদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা আহলেহাদীছ সমাজের সাহিত্য ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধি করবে এবং তা ছাত্র-ছাত্রীদের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হবে এ প্রত্যাশায়--

মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন
প্রভাষক
আল-হেরা ডিগ্রী কলেজ
হামিদপুর, যশোর।

বাণী

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এ দেশের একক যুবসংগঠন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্মরণিকা-২০১০ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভ করে শুধুমাত্র আল্লাহর শাশ্বত বিধান ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহর প্রচার করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ চলার পথ এতই অমসৃন যে ইতিহাস প্রতিনিয়ত তার প্রমাণ বহন করে চলছে। দুর্বলচেতা ঈমানদাররা ছিটকে পড়ছে এ থেকে, আর যারা আঁকড়ে ধরে আছে তাদেরকে নব্য জাহেলিয়াতের ছোবলে অনবরত জর্জরিত করছে। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও প্রচলিত গণতন্ত্রের লেবাসধারী ইসলামী গণতন্ত্রবাদ যখন মানুষের সামনে দৃষ্টি নন্দন দুনিয়ার স্বপ্নে বিভোর করছে, তখন নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে আমাদের প্রাপ্তি হতাশ করলেও আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলব। মহান আল্লাহর ভাষায় 'কতই না কম সংখ্যক দলকে বিজয় দান করেছি বেশী সংখ্যকের উপরে'। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরে শিরক-বিদ'আত মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাব। অভ্রান্ত সোপানে ভেদাভেদ ভুলে পরস্পরকে সাথে নিয়ে। তাহলেই যাওয়া যাবে সিধা ফেরদৌসে। আমীন!!!

মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর
সিনিয়র অফিসার
ইসলামী ব্যাংক, বগুড়া শাখা।

বাণী

উত্তরবঙ্গের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** দীর্ঘদিন ধরে অভ্রান্ত সত্যের উৎস অহি-র আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিশুদ্ধ আক্বীদা প্রসারের মাধ্যমে চরিত্রবান আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সেশনের দায়িত্বশীলরা একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রথমবারের মত স্মরণিকা প্রকাশের এই মহতী প্রয়াসকে স্বাগত জানাচ্ছি। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে জীবনকে বিকশিত করার এক মহৎ প্রত্যয় আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মীদের মধ্যে লক্ষণীয়। তাই তাদের বলব, শিক্ষার এই পবিত্র অঙ্গন থেকে অর্জিত তোমাদের জ্ঞান ও মনন দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত হবে। তোমরা জীবন সংগ্রামে জয়ী হও। মনে রেখো, চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়- অনেকাংশেই কণ্টকাকীর্ণ। এ দুর্গম পথ অতিক্রম করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। থেমে থাকলে চলবে না। গতিই জীবন। বাধা অতিক্রমের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা মতিহারের সবুজ চত্বর অহির বিধানের আলোকে আলোকিত করে তোল। তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এই যুবসংগঠন যুগ যুগ ধরে স্বকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করতে থাকুক। আমি সর্বান্তকরণে মহান আল্লাহর নিকট আদর্শবাদী এই সংগঠনের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি-অগ্রগতি কামন করছি।

ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী সিটি ক্যাম্পাস।

বাণী

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

ইংরেজী ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার দেশের কিছু আহলেহাদীছ যুবকদের নিয়ে যে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** নামে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী একক যুব সংগঠন গঠিত হয়েছিল হাঁটি হাঁটি পা পা করে এখন জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তাদের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি স্মরণিকা এবং 'যুবসংঘ বার্তা' ও 'আল-ইত্তেহাদ' নামে দু'টি সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি মুখপত্র হিসাবে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক' এর ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'**র বর্তমান কর্মপরিষদের তত্ত্বাবধানে স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আনন্দ ও গর্ববোধ করছি। একটি সংগঠনের স্মরণিকা তার বিগত দিনের উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতা পাঠকদেরকে সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। সাথে সাথে সংগঠনের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মূল্যায়ন করাও সম্ভব হয়। অহি-ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এ স্মরণিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দিনের কর্মতৎপরতার মূল্যায়ন ও আগামী দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি মাইলফলক হবে আশা করি। যারা এ মহৎ কাজটির দায়িত্ব নিয়েছে তাদের জাযায়ে খায়ের আল্লাহর কাছে কামনা করছি। -আমিন!

এইচ. এম. মুহসিন
কাজীরহাট ডিগ্রী কলেজ,
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বাণী

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথমবারের মত স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও আন্তরিক মুবারকবাদ।

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিদ্যাপীঠে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর ন্যায় নির্ভেজাল দ্বীনী সংগঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির যাতাকলে নিষ্পেষিত শিক্ষার্থীর হাতে কলমের পরিবর্তে শোভা পাচ্ছে মারণাস্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নোংরা পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়তে এই স্মরণিকা দিকদিশারী হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করি। সেই সাথে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আদর্শিক সংগঠন হিসাবে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করুক এটা আমাদের প্রত্যাশা। এই স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন- আমীন!

মুহিববুর রহমান হেলাল
হাড়াভাঙ্গা, মেহেরপুর।

বাণী

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

আল্লাহর অশেষ রহমতে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মূলেই সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চারিত হয়েছে 'সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর' শ্লোগান। এরা নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। এদের লক্ষ্য এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ। এ কারণে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছর তারা স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে তাদের কর্মতৎপরতার লৈখিক ছাপ রাখতে যাচ্ছে। আমি তাঁদের এ সাহসী পদক্ষেপ ও অগ্রযাত্রাকে স্বাগত জানাই। সাথে সাথে দো'আ করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার ও আগামী দিনের সমাজ বিপ্লবের অগ্রসেনা হিসাবে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন!!!

আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস
সহকারী শিক্ষক,
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজাশাহী।

যুবসংঘ রাবির সাবেক সভাপতিদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	যেলার নাম	সেশন
১	ড. ওসমান গণি	ঠাকুরগাঁও	১৯৮৮-৮৯
২	মোরশেদুল বারী	মেহেরপুর	১৯৯০-৯১
৩	রফীকুল ইসলাম	খুলনা	১৯৯২-৯৩
৪	শামসুল আলম	যশোর	১৯৯৩-৯৫
৫	এস. এম. হাবীবুল্লাহ	সাতক্ষীরা	১৯৯৫-৯৬
৬	ড. সাখাওয়াত হুসাইন	কুমিল্লা	১৯৯৬-৯৭
৭	আকবর হুসাইন	যশোর	১৯৯৭-৯৯
৮	হুমায়ুন কবীর	বগুড়া	১৯৯৯-২০০০
৯	ড. আতাউর রহমান	সাতক্ষীরা	২০০০-০৩
১০	এইচ. এ. মুহসীন	সাতক্ষীরা	২০০৪-০৫
১১	মহিববুর রহমান হেলাল	মেহেরপুর	২০০৫-০৬
১২	আব্দুল হালীম	রাজশাহী	২০০৬-০৮
১৩	ইমামুদ্দীন	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২০০৮-বর্তমান

আহলেহাদীছের পরিচয়

-*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*[*]

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যবাচক শব্দ, যা ব্যাপক অর্থে এমন একটি আন্দোলন এবং সাধারণ অর্থে এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝায় যে আন্দোলন বা যে ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে ইসলামের মূলসূত্র তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকজ্জ্বল পথে জীবন পরিচালনার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক বিশৃংখলার সাথে সাথে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে যে বিভ্রাট ঘটে যায় এবং মুসলিম সমাজে ইসলামের বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সংযোজন-বিয়োজনের যে প্রবণতা সৃষ্টি হয় তা থেকে আত্মরক্ষা ও মানবসমাজকে পুনরায় নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারী তাবেঈ', তাবে'-তাবেঈ'গণ যে আন্দোলন শুরু করেন তা-ই ইতিহাসে আহলেহাদীছ আন্দোলন নামে খ্যাত। এ সময় যারা বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কেবলমাত্র অহির বিধানের প্রতি নিঃশর্তভাবে আনুগত্যের মস্তক অবনত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তারাই অভিহিত হতে থাকলেন আহলেহাদীছ নামে। এককথায় বিশ্বাস, কথা ও কর্মে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে সমস্ত কিছুর উপরে স্থান দিয়ে থাকে তাদেরকেই আহলেহাদীছ বলা হয়।

নামকরণের কারণ

আহলুল হাদীছ, আহলুল আছার বা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত শব্দগুলো ১ম ও ২য় শতাব্দী হিজরীতে শী'আ, খারেজী, মুরজিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটার পর বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্নদের পরিচয় নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ' ও তাবে' তাবেঈ'গণ অনেকেই এই নামে নিজেদের অভিহিত করতেন।

ইতিহাসক্রম

খলীফা আল-মামূনের আমলে মু'তাযিলা তথা যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের তৎপরতা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। স্বয়ং খলীফা এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের আবিষ্কৃত 'কুরআন সৃষ্ট' এই ভ্রান্ত মতবাদ মুসলিম সমাজে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে। খলীফা মামূন এই তত্ত্বের সমর্থক হওয়ায় বিরোধীদের উপর নেমে আসে সরকারী নির্যাতন। এই সময় আহলেহাদীছগণ এই মতবাদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন যার নেতৃত্বে ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল। এ জন্য তাঁকে ও তাঁর সাথীবর্গকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়। শেষ পর্যন্ত পরবর্তী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ-এর নির্দেশে ইমাম আহমাদ ও তাঁর সাথীদেরকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে 'কুরআনের সৃষ্টতা' ফিতনার অবসান ঘটে এবং আহলেহাদীছদের গৃহীত মাসলাক জনসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার দ্বার অবারিত হয়। সৃষ্টি হয় মুসলিম সমাজে জেঁকে বসা শিরকী ও বিদ'আতী চিন্তাধারার অবসানের জন্য একটি সুদৃঢ় আন্দোলন। যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলিম সমাজ যখনই ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে নানা বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার সাথে মিশে গেছে তখনই তাদের জন্য ত্রাণকর্তা হিসাবে ইসলামের প্রকৃত বার্তাকে উড্ডীন করার দায়িত্ব নিয়ে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম জানবাজি রেখে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এজন্যই ইমাম আবু দাউদ বলে গেছেন, 'এই জামা'আতটি যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে দুনিয়া থেকে ইসলাম মুছে যেত' (*শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ২৭*)। খত্বীব বাগদাদী বলেন, 'আহলুল হাদীছগণ কথা ও কর্মের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) আনীত শরী'আতকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাঁর সুন্নাতকে তারা সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে পাহারা দিয়েছেন; ফলে সুন্নাত সমাজের বুকে একটি প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি লাভ করেছে। মূলত আহলেহাদীছগণই এ মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত এবং

---

[*] এম.এ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তারাই এর অধিকারী। কত ধরনের বেদ্বীন ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে শরী'আত বহির্ভূত বিষয় অন্তর্ভূক্তির প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র রাব্বুল আলামীন আহলেহাদীছদের মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ করেছেন। ফলে তারা এ দ্বীনের হেফাযতকারীতে পরিণত হয়েছেন' *(শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৩১)*।

আহলেহাদীছগণের গৃহীত নীতিমালা

আহলেহাদীছগণ ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈনের ইযামের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী দ্বীনকে অনুসরণ করেন। কেননা তারাই ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর সবচেয়ে নিকটতম ও বিশ্বস্ত অনুসারী। তাই আহলেহাদীছগণের গৃহীত নীতিমালা মূলত সালাফে ছালেহীনের গৃহীত নীতিমালা, যা আল্লাহ প্রেরিত অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আহলেহাদীছদের বাহ্যিক নিদর্শন হ'ল এই যে, তারা আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সুন্নাতপন্থী। নিম্নে- সংক্ষেপে তাদের অনুসৃত মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করা হ'ল।

১. **তাওহীদঃ** আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, তাওহীদ হ'ল দ্বীনের মূল ভিত্তি। তারা আক্বীদার ক্ষেত্রে নির্ভেজাল তাওহীদকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। বিশেষত তাওহীদে উলূহিয়্যাহ তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এককত্বকে মানুষের মনের গভীরে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। তারা আল্লাহ্কে বিশ্বজগতের প্রভু হিসাবে স্বীকার করাকেই যথেষ্ট মনে করেন না; বরং মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও তাঁর প্রেরিত শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নকে অপরিহার্য মনে করেন। একই সাথে তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব খর্বকারী যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারাকে তারা শিরক মনে করেন এবং সর্বপ্রকার শিরককে তারা চূড়ান্তভাবে ঘৃণ্য মনে করেন। তারা শিরক থেকে নিজে রক্ষা পাওয়া ও অপরকে রক্ষা করাকে নিজেদের সর্বোচ্চ কর্তব্য মনে করেন।

২. **ইত্তিবায়ে সুন্নাতঃ** আহলেহাদীছগণ রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির, আহাদ হাদীছসমূহকে সালাফে ছালেহীনের নীতিমালার আলোকে অনুসরণ করাকে আবশ্যকীয় মনে করেন। অতঃপর ছাহাবায়ে কেরামের ইজমা' তথা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তকে তারা শরয়ীঈ দলীল মনে করেন। এই তিনটি সূত্রকে তারা শরী'আতের মানদণ্ড মনে করেন। এই তিনটির উপস্থিতিতে তারা কোন ইজতিহাদী চিন্তাধারাকে স্বীকৃতি দেন না। নিজস্ব বিবেক ও কিয়াস দ্বারা তাকে খন্ডানোর কোনরূপ সুযোগ রাখেন না। তারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করেন না। বরং ইজতিহাদের দুয়ারকে তারা শর্তপূরণ সাপেক্ষে সর্বকালের যোগ্য আলেমদের জন্য উন্মুক্ত মনে করেন। তারা প্রত্যেক ওলামায়ে মুজতাহিদীন ও অনুসরণীয় ইমামগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং তাদের বিশুদ্ধ দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেন। কিন্তু দলীলবিহীন এবং রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের বিপরীত যে কোন সিদ্ধান্তকে তারা সর্বতোভাবে বর্জন করেন।

৩. **মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান-বিবেকের উপর অহিকে অগ্রাধিকার প্রদানঃ** আহলেহাদীছগণ নিজস্ব চিন্তাধারার উপরে অহির বর্ণনাকে স্থান দেন। শরী'আত কি বলে তা জানার পর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে তার প্রতি সমর্পিত করে দেন। কেননা তারা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি নিশ্চিতভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সিদ্ধান্তের সাথে সমতা রক্ষা করে। এজন্য শরী'আতের সিদ্ধান্তের উপর নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়ে তার কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধনকে তারা ঘোরতরভাবে নিষিদ্ধ মনে করেন।

৪. **বিদ'আত বর্জনঃ** তারা দ্বীনের মধ্যে নবআবিষ্কৃত কোন বিষয়কে কখনই প্রশ্রয় দেন না। দ্বীনের মধ্যে নবআবিষ্কারকে তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশনা বহির্ভূত অন্যায় সংযোজন এবং নিজস্ব কপোলকল্পিত বিষয় দ্বারা শরী'আত রচনার শামিল মনে করেন। এজন্য তারা সুন্নাতের অনুসরণে যেমন আপোষহীন তেমনিভাবে সর্বপ্রকার বিদ'আত বর্জনে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন।

৫. যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন: এ সমস্ত হাদীছ মুসলিম উম্মাহকে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ থেকে বাধাগ্রস্ত করছে ও তাদের মাঝে অনৈক্যের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। এজন্য তারা এ জাতীয় হাদীছগুলোকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন।

৬. জিহাদ: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে তারা সর্বোত্তম নেক আমল মনে করেন এবং জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর তথা সশস্ত্র জিহাদ আল্লাহ্র কালেমা তথা বার্তাকে বুলন্দ করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে বলে বিশ্বাস করেন। তবে তারা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আকস্মাৎ অস্ত্রধারণকে জিহাদ মনে করেন না। বরং জিহাদের জন্য সুনির্দিষ্ট শর্তপূরণকে তারা অপরিহার্য মনে করেন।

৭. তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি: আত্মশুদ্ধির জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালানোকে তারা জরুরী মনে করেন, তবে তা অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বর্ণিত পন্থা অনুযায়ী হ'তে হবে। বিদ'আতী কোন পন্থাকে তারা আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যম বলে স্বীকার করেন না; হোক তা ছূফীবাদী বা অন্য কোন দলের উত্তম কোন আবিষ্কার।

৮. বাতিল ফিরকা সমূহের প্রতিরোধ: ইসলামের নামে যুগে যুগে আবির্ভূত বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। মূলতঃ আহলেহাদীছগণের সংগঠিত অগ্রযাত্রা শুরু হয় এসব বাতিল ফিরকাগুলো প্রতিরোধ করে ইসলামের প্রকৃতরূপকে ফিরিয়ে আনার জন্যই। বর্তমান যুগের ভ্রান্ত ফিরকাসমূহ যেমন শী'আ, কাদীয়ানী, ব্রেলভী, বাবী, বাহাইয়াহ প্রভৃতিসহ ইসলাম সমর্থিত নয় এমনসব সমকালীন বিজাতীয় চিন্তাধারা যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ইত্যাদি যাবতীয় পথভ্রষ্টকারী ফিরকা ও চিন্তাধারাকে শারঈ পন্থাসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মোটকথা আহলেহাদীছগণ মনে করেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিরঙ্কুশ তাওহীদকে স্বীকৃতিদান এবং রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ তথা সুন্নাতের পুংখানুপুংখ অনুসরণই একজন মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি দিতে পারে। এ দু'টি পথ অবলম্বনই যাবতীয় সৎআমল কবুলের পূর্বশর্ত, দুনিয়াবী জীবনে বিজয় ও শক্তি অর্জনের ভিত্তি। ব্যষ্টিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা মানবজীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে এ দু'টি পথ অবলম্বনই ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত। এজন্য তারা সমাজকে সর্বতোভাবে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত করে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। আক্বীদাগত ও আচরণগত দূরীষ্টতা দুরীকরণে নিরন্তর দা'ওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে থাকেন। দুর্বল ও জাল হাদীছসমূহকে চিহ্নিত করে সমাজকে তা বিরত রাখার প্রয়াস চালান। মুসলিম উম্মাহকে স্ব স্ব পূর্বপুরুষগণ থেকে প্রাপ্ত ইসলামের পথে নয় বরং বিশুদ্ধ ইসলামের পথে পরিচালনার জন্য তারা সর্বশক্তি আত্মনিয়োগ করেছেন।

শেষকথা

পরিশেষে বলা যায়, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হিসাবে মানবসমাজকে ইসলামের আদিরূপে ফিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাচীন ও চলমান একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন যেমনি ইসলামের মৌলিকরূপকে জনসমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনিভাবে ইসলামের অভ্যন্তরে যেসব নবাবিস্কৃত দর্শন, রীতিনীতি ও কুসংস্কারের অবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে, প্রতিটির বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। পৃথিবীর বুকে যতদিন পর্যন্ত একটি কুসংস্কারও জারী থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে। আর এভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দ্বীনকে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখবেন। আল্লাহ্র রাব্বুল আলামীন বলেন, 'তিনি তার রাসূলকে সঠিক পথ ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে করে তা সমস্ত ধর্মসমূহের উপর বিজয়ী থাকে। যদিও অংশীবাদীগণ তা অপসন্দ করে' (*ছফ ৯*)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সবসময় সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে, তাদের বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না কিয়ামত পর্যন্ত (*মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭*)।

যুগে যুগে আহলেহাদীছ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম *

আহলেহাদীছ মুসলিম উম্মাহর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি গুণবাচক নাম। 'আহল' ও 'হাদীছ' এদু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত 'আহলেহাদীছ'-এর অর্থ হাদীছের অনুসারী। পরিভাষায় কুরআন ও হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীকে 'আহলেহাদীছ' বলে। আহলেহাদীছ মূলতঃ একটি আন্দোলন। মাযহাবী বেড়াজালকে ছিন্ন করে বিভক্ত মুসলিম জাতিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম মূল লক্ষ্য। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে সমস্ত মানবমণ্ডলীর নিকট পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নির্ভেজালরূপে উপস্থাপন করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এজন্য সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ, নিঃশর্ত ও নিরপেক্ষ অনুসারী হতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের শাব্দিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও ব্যবহারিক অর্থও তাই। এর উপর আমল করাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসার উত্তম ও মোক্ষম পন্থা। ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার উপরই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মাগফিরাত ও নাজাত নিহিত। আহলেহাদীছগণ তাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবী (ছাঃ)-এর অমিয়বাণী ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার জন্য উদাত্ত আহবান জানায় দুনিয়ার মানুষের কাছে। এটা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও গুণ। কিন্তু অনেকের ধারণা প্রচলিত চার মাযহাবের ন্যায় আহলেহাদীছও একটি মাযহাব, যার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব আন-নাজদী। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা আহলেহাদীছগণ কোন মাযহাব বা ব্যক্তি বিশেষের অনুসারী নন; বরং আহলেহাদীছগণ মহানবী (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী। আর এই নামও স্বয়ং রাসূলের দেয়া যা রাসূল ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে এসেছে। নিম্নের হাদীছটি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ:

عن أبي سعيد الخدرى رضــ أنه إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم فى المجالس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا.

আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন তিনি কোন যুবককে দেখতেন তখন বলতেন, রাসূলুল্লাহর (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাদের জন্য মজলিসে জায়গা করে দেওয়ার এবং তোমাদেরকে হাদীছ বুঝানোর জন্য আমাদের আদেশ করেছেন। কারণ তোমরা আমাদের পরবর্তী বংশধর এবং পরবর্তী আহলেহাদীছ।[১]

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আহলেহাদীছ নামটি স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া। পক্ষান্তরে কুরআনের দেওয়া নাম হচ্ছে মুসলিম। মূলতঃ মুসলিম ও আহলেহাদীছ নামদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ মুসলিম তিনি, যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আদেশ-নিষেধের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। অপরদিকে আহলেহাদীছগণও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী। তাই আহলেহাদীছ ও মুসলিম নামদ্বয় মূলতঃ এক ও অভিন্ন। কিন্তু মুসলিম জাতি আজ হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, শী'আ, মুরজিয়া, খারেজী, রাফেযী, মু'তাযিলা ইত্যাদি অসংখ্য দলে বিভক্ত। এই সব দল মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য-সংহতিকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে। অথচ এরা সবাই মুসলিম নামে নিজেকে পরিচয় দিতে ব্যস্ত। যদিও এদের কোন কোন দল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিরক, বিদ'আত ও কুফরের মত জঘন্য পাপেও লিপ্ত। তাই মুসলিম জাতি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায়

***** **কেন্দ্রীয়** সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

১. শারফু আছহাবিল হাদীছ , পৃ. ১২; মুস্তাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮।

রাখার জন্য যুগে যুগে নিজেদেরকে 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচয় দিয়ে আসছে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত সত্য ও ন্যায়ের পথে তথা ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের দিকে মানুষকে ডেকেছে; শতছিন্ন মুসলিম জাতিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছে। এই আহলেহাদীছ জামা'আত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হ'ল।-

হিজরী ১ম শতকে আহলেহাদীছ : সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) গর্বভরে নিজেকে আহলেহাদীছ বলতেন। তিনি বলতেন, أنا أول صاحب حديث في الدنيا আমিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম আহলেহাদীছ'।[2] যে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের দ্বীনের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মহানবী স্বয়ং দো'আ করেছিলেন, সেই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে আহলেহাদীছ বলা হয়েছে।[3] বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম শা'বী যিনি ৫০০ ছাহাবীর দর্শন লাভ করেছেন এবং ৪৮ জন ছাহাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেছেন, তিনি বলেছেন, 'যে সব মাসআলায় আহলেহাদীছগণ একমত হয়েছেন আমি কেবল সেই সব হাদীছগুলো বর্ণনা করেছি। হাফেয যাহাবী বলেন, ইমাম শা'বীর উক্তিতে আহলেহাদীছ শব্দ দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামের দলকে বুঝানো হয়েছে'।[4] অতএব বুঝা যায় ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগেও আহলেহাদীছ পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল।

মিসর, সিরিয়া, আযারবাইজান, আলজেরিয়া, স্পেন, আবিসিনিয়া, রোম, পারস্য, আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যেসব মহামনীষী ইসলামের মশাল বয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা কেউই প্রচলিত চার মাযহাবের অনুসারী কিংবা শী'আ, খারেজী, রাফেযী, মু'তাযিলা, মুরজিয়া বা অন্য কোন দলের অনুসারী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী আবু মানছূর বাগদাদী লিখেছেন, 'রোম, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান ও বাবুল আবওয়াব প্রভৃতি স্থানের মুসলিম উপনিবেশ সমূহের অধিবাসীগণ আহলেহাদীছ ছিলেন। তদ্রূপ আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পিছন দিকের দেশসমূহের মুসলিম উপনিবেশগুলোর অধিবাসীরা আহলেহাদীছ ছিলেন। এইরূপ আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়েমেনের সমস্ত সীমান্তবাসীগণও আহলেহাদীছ ছিলেন'।[5] অতএব বুঝা যায়, হিজরী ১ম শতকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আহলেহাদীছ ছিল ।

হিজরী ২য় শতকে আহলেহাদীছ : হানাফী ফিক্হ শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ দুররুল মুখতার-এর প্রণেতা লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর যুগে আহলেহাদীছের অস্তিত্ব ছিল।[6] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'আমার সাথে সাধারণ লোক ও আহলেহাদীছদের সাক্ষাৎ হ'ত । তন্মধ্যে কতিপয় হলেন আহমাদ ইবনু হাম্বল, সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ ও আওযাঈ প্রমুখ'।[7]

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর ছাত্র তাবেঈগণ এবং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেঈ সবাই ছিলেন হিজরী ২য় শতকের লোক। উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় শতকেও বহু আহলেহাদীছ বাগদাদ, কূফা, সিরিয়া, মক্কা, মদীনাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যমান ছিল ।

হিজরী ৩য় শতকে আহলেহাদীছ : ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯) তাঁর বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ সুনান তিরমিযীতে 'আহলেহাদীছ' ও 'আছহাবুলহাদীছ' শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। শামী গ্রন্থে উল্লেখ

---

২. ইছাবা, ৪র্থ খণ্ড , পৃ. ৩৮৬; তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২; তারীখু বাগদাদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭ ।
৩. তারীখু বাগদাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৭; তাবাকাতে যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩ ।
৪. তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭ ।
৫. উছূলুদ্দীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।
৬. দুররুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩০।
৭. রাহলাতুশ শাফেয়ী, পৃ. ১৪।

আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদের ছাত্রের ছাত্র আবুবকর আল-জাওজানী বিচারপতি থাকাকালে একদা জনৈক হানাফী লোক এক আহলেহাদীছ কন্যাকে তার পুত্রের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আহলেহাদীছ লোকটি বলল যে, আমার কন্যাকে আপনার পুত্রের সাথে এ শর্তে বিয়ে দিতে পারি যে, আপনি হানাফী মাযহাব ছেড়ে দিবেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বেন, রুকূতে যাবার সময় রাফঊল ইয়াদায়েন করবেন। এভাবে আহলেহাদীছের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি পালন করবেন। তখন সে হানাফী লোকটি এ শর্তগুলি মেনে নেয় এবং আহলেহাদীছ লোকটি হানাফী লোকটির পুত্রের সাথে স্বীয় কন্যার বিয়ে দেয়।[৮]

ইমাম তিরমিযী ও বিচারপতি আবুবকর উভয়েই হিজরী তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন। সুতরাং উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিজরী তৃতীয় শতকে আহলেহাদীছ নামে একটি স্বতন্ত্র জামা'আত ছিল এবং তারা অন্যকে নিজেদের আক্বীদা ও আমলে দীক্ষিতও করত ।

হিজরী ৪র্থ শতকে আহলেহাদীছ : মুসলিম মনীষা গ্রন্থ প্রণেতা বিচারপতি আবদুল মওদূদের মতে, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলির ভৌগলিক সীমা বর্ণনায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ভূ-তত্ত্ববিদ হ'লেন আল-মাক্বদেসী। তিনি ৩৭৫ হিজরীতে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি সিন্ধুর মান্‌ছূরা (করাচী) নামক স্থান সম্পর্কে লিখেছেন, أكثرهم أهل الحديث 'এখানকার অধিকাংশ (মুসলিম) অধিবাসী আহলেহাদীছ'।[৯] সুতরাং মাক্বদেসীর এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চতুর্থ শতকে আহলেহাদীছ ছিল।

৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে আহলেহাদীছ : আবদুল ক্বাদের জিলানী (রহঃ) (৪৭০-৫৬১ হিজরী)। তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ গুনিয়াতুত ত্বালেবীন-এ আহলেহাদীছের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানদের তিয়াত্তর ফের্কার মধ্যে নাজী ফের্কা (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন, أهل السنة لا اسم لهم الا اسم واحد وهو أصحاب الحديث 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি মাত্র নাম আছে, আর তাহ'ল 'আহলেহাদীছ' *(গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, করাচী ছাপা, পৃ. ৩০৯-১০)*। আব্দুল কাদের জিলানীর মন্তব্য দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, হিজরী ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও আহলেহাদীছ ছিল। হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিক্‌হ গ্রন্থ 'হিদায়া'তে লেখা আছে, 'ইজমা আছে যে, আহলেহাদীছ সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত এবং হক্বের (সত্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ইক্বতিদা (অনুসরণ) করা হানাফীদের জন্য জায়েয'।[১০] এ গ্রন্থটি ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৬৮ হিজরীতে) রচিত হয়েছে। সুতরাং হিদায়ার উল্লেখিত উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, ৬ষ্ঠ শতকেও আহলেহাদীছ ছিল।

হিজরী ৭ম ও ৮ম শতকের আহলেহাদীছ : হিজরী ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর বিশ্ববরেণ্য মনীষী হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭১৫হি.) চার মাযহাবের কোন একটি বিশেষ মাযহাবের তাক্বলীদ করাকে 'বিদ'আত' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, إنما حدثت هذه البدعة فى القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم 'হিজরী ৪র্থ শতকে এই মাযহাবের তাক্বলীদ করা 'বিদ'আত' চালু হয়েছে। এটা সেই যুগ যার নিন্দা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রসনা হ'তে নিঃসৃত হয়েছে'।[১১] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমের মন্তব্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতেও এমন বহু লোক ছিলেন যারা চার ইমামের কোন

---

৮. শামী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪, 'বাবুত তা'যীর'।
৯. আহসানুত তাক্বসীম, পৃ. ৪৮১।
১০. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৮।
১১. ই'লামুল মু'আক্বেইন, দিল্লী ছাপা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।

এক বিশেষ ইমামের তাক্বলীদ করাকে 'বিদ'আত' মনে করতেন। যা আহলেহাদীছের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হিজরী ৭ম ও ৮ম শতকেও আহলেহাদীছগণ তাদের ঝাণ্ডা উঁচু করে রেখেছিলেন।

হিজরী ৯ম ও ১০ম শতকে আহলেহাদীছ : ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রাণী (মৃত ৯৩৭হি.) চার মাযহাব সৃষ্টি হওয়ার সময় হ'তে স্বীয় যুগ পর্যন্ত আহলেহাদীছ আলেমদের এক বিরাট দলের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসারী ছিলেন না।[১২] ইমাম শা'রানী ছিলেন দশম শতাব্দীর লোক। সুতরাং তাঁর এ তালিকা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিজরী নবম ও দশম শতকেও আহলেহাদীছদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছিল।

হিজরী ১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতকে আহলেহাদীছ : ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫৫ হি.) লিখেছেন, 'শুধু আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে সৈয়দ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীর সান'আনীকে (১০৯৯-১১৪২ হি.) বিরোধীদের হাতে অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল'।[১৩] তিনি আরো লিখেছেন যে, অন্যান্য দেশের মত ইয়েমেনেও অনেক আহলেহাদীছ ছিলেন'।[১৪] ইমাম শাওকানী হিজরী ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীর লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁর উল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হিজরী ১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতকের পূর্বেই আহলেহাদীছ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হিজরী ১২শ ও ১৩শ শতকে ভারতবর্ষে আহলেহাদীছদের সে মহান মনীষীও জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁর সম্পর্কে প্রাচ্যের দার্শনিক, ইসলামের দৃপ্ত নকীব মহাকবি ইকবাল বলেছেন, ভারত এ পর্যন্ত একজন প্রকৃত আলেমের জন্ম দিয়েছে এবং তাঁর নাম ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬ হি.) (রহঃ)।[১৫] প্রোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১২শ ও ১৩শ শতকে ভারতেও আহলেহাদীছ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৩শ শতকে ভারতের কনৌজে গ্রন্থ প্রণয়ন, সংকলন ও মুদ্রণে সাত রাজার ধন এক মাণিক জ্বলে উঠলো, যার নাম নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান (জন্ম ১২৪৮হি./১৮৩২)। তিনি ছিলেন সুন্নাতে রাসূলের অকৃত্রিম আশেক্ব এবং হাদীছে নববীর একান্ত সেবক। তিনি ভারতবর্ষে হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে খরচ করে ভারতে 'ছিদ্দীক্বে আকবর' নামে পরিচিত হ'লেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু দুর্লভ ও অমূল্য গ্রন্থ আনিয়ে ভারত, মিসর ও বৈরুতের বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন।

এর ফলে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের এমন কোন গ্রন্থাগার নেই যেখানে 'ছিদ্দীক্বে আকবরের' কমপক্ষে একখানা গ্রন্থ নেই। হাদীছের সেবায় শুধু অর্থ ব্যয় করে ক্ষান্ত হননি বরং নিজেও কলম ধরেছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তিন শতাধিক গ্রন্থ লিখে এবং আরবী বর্ণমালার 'আলিফ থেকে ইয়া' পর্যন্ত প্রত্যেক বর্ণে কমপক্ষে একটি করে গ্রন্থ রচনা করে সারা বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এভাবে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু অমূল্য রত্ন বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে হিজরী ১৩শ শতকের 'মুজাদ্দিদে উলূম' উপাধিতে ভূষিত হ'লেন ।

বর্তমান শতকে আহলেহাদীছ : ১৩শ শতকে ভারতবর্ষে আহলেহাদীছদের এক উজ্জ্বল ভাস্কর উদিত হয়েছিল, যাঁর সম্পর্কে ভারতরত্ন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মন্তব্য করেছেন, 'তিনি তাঁর যুগে (১৩শ

১২. ইক্বদুল জীদ, পৃ. ৯৮।
১৩. আল-বাদরুত তালে, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭।
১৪. ঐ; তরীক্বায়ে মোহাম্মাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০।
১৫. মুসলিম মনীষা, পৃ. ২৫৭।

ও ১৪শ) প্রায় সারা বিশ্বের শায়খুল ইসলাম ছিলেন'। এই মহামনীষী হ'লেন 'শায়খুল কুল ফিল কুল' সৈয়দ মাওলানা নাযীর হোসাইন দেহলভী মিঞা ছাহেব (মৃত ১৩২০হি.)। তিনি ১২২০ হিজরী মোতাবেক ১৮০৫ সালে এক হানাফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের আলো পেয়ে কোন নির্দিষ্ট ইমামের অন্ধ অনুসারী না হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হন। এই মহামনীষী বহু উত্থান-পতন ও সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ ৭৫ বছর কুরআন ও হাদীছের সুধা বিতরণ করে লক্ষাধিক ছাত্র এবং ৮০ লক্ষ লোককে আহলেহাদীছ করেন। পৃথিবীতে এমন কোন মুসলিম দেশ নেই যেখানে কমপক্ষে এ মনীষীর একজন ছাত্র নেই। তিউনিসিয়া বংশোদ্ভূত মুহাদ্দিছে আযম আল্লামা ইয়াহইয়াহ সানসুনী (রহঃ) ঐ মনীষীরই ছাত্র। এই দীপ্ত রবির কিরণে ভারতবর্ষের হাদীছ গগনের নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হ'লেন জামে' তিরমিযীর ভাষ্যকার 'তুহফাতুল আহওয়াযী' প্রণেতা আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, 'সুনানু আবিদাউদ'-এর ভাষ্যকার 'আওনুল মা'বূদ' ও 'গায়াতুল মাকছু'দ রচয়িতা আল্লামা শামসুল হক্ব ডিয়ানবী ও মাওলানা শারফুল হক্ব বিহারী প্রমুখ। এই জ্ঞানের পরশ পাথরের পুণ্য পরশেই আর্য-খৃষ্টান ও কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী যুক্তির বিরুদ্ধে কাঁচকাটা হীরকখণ্ডে পরিণত হ'লেন আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী, মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী ও মাওলানা ইব্রাহীম শিয়ালকোটী প্রমুখ।

এই জ্ঞানসাগরেরই কুরআন ও হাদীছের অমৃত সুধা সিঞ্চনে বাংলার মাটিকে সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা করে তোলেন আল্লামা আইনুদ্দীন, মাওলানা নে'আমাতুল্লাহ, মাওলানা ইবরাহীম শেরশাহী, মাওলানা ইবরাহীম দেবকুণ্ডী, হুগলীর মাওলানা অব্দুল লতীফ, ২৪পরগনার মাওলানা আব্দুল বারী, রংপুরের আল্লামা আব্দুল হাদী এবং আসামরত্ন সিলেটের মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের। এসব গুণমণিদের কুরআন-হাদীছের বীজ বপনে বাংলার শ্যামল ক্ষেতে সোনার বাংলা রূপ দিল বাংলা ভাষায় কুরআনের সর্বপ্রথম মুসলিম অনুবাদক মাওলানা আব্বাস আলী, বাংলা, আসাম ও বিহারের বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা গগনের উজ্জ্বল নিহারিকা, আহলেহাদীছ পত্রিকার দিকপাল মাওলানা বাবর আলী, বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীরকারক ও অভিনব পদ্ধতিতে রাসূলে (ছাঃ)-এর জীবনী লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ, জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী ও তাঁর ভাই আব্দুল্লাহিল বাকী এবং মাওলানা ইফাযুদ্দীন সহ আরো অনেকে। এই সব মনীষীদেরই অক্লান্ত সাধনার ফসল হিসাবে আজও বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলাসহ সমস্ত ভারত উপমহাদেশে কুরআন-হাদীছের একনিষ্ঠ সেবক ও নির্ভীক প্রচারক আহলেহাদীছদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকে প্রতি যুগে আহলেহাদীছ ছিল, আজও আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' (মুসলিম)। ইমাম আলী বিন মাদীনী বলেছেন, 'ঐ দলটি হ'ল আহলেহাদীছ'। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও বলেন, 'দলটি আহলেহাদীছ না হ'লে আমি জানি না তারা কারা?' *(ফাতহুল বারী)*। উল্লেখিত দুই মুহাদ্দিছের উক্তি অনুযায়ী বুঝা যায়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যে দলটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা হ'ল আহলেহাদীছ।

অতএব আসুন! দুনিয়াবী সকল স্বার্থদ্বন্দ্ব পরিহার করে অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ্র অহি তথা কুরআন-হাদীছের অনুসারী হই এবং নিজে একজন আহলেহাদীছ তথা খাঁটি মুসলমান হয়ে শতদলে বিভক্ত মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন !!

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যকতা

ইমামুদ্দীন *

মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকী বসবাস করতে পারে না। সকলে মিলেমিশে সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে। এই সংঘবদ্ধ জীবন যাপন পদ্ধতিকে আমরা জামা'আতবদ্ধ জীবন বা সাংগঠনিক জীবনের সাথে তুলনা করতে পারি। উল্লেখ্য যে, কিছু মানুষ বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যখন একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায় তখন তাকে জামা'আত বলা হয়। মুসলিম জাতিকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন বেশ কিছু আয়াতও নাযিল করেছেন। একইভাবে মানবতার মুক্তির অগ্রদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্নভাবে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি এবং তাঁর ছাহাবীগণ এ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নও বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে গেছেন। বিধায় সংঘবদ্ধ জীবন যাপন মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, মানুষ স্বভাবগতভাবেই সাংগঠনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। যেমন প্রতিটা মানুষ জন্মের পর থেকেই পিতা-মাতার অধীনে লালিত-পালিত হয়ে পারিবারিক সংগঠন কায়েম করে। ঠিক বেশ ক'টা পরিবার একজন সমাজপতির অধীনে সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে সাংগঠনিক জীবন যাপন করে চলেছে। এককথায় সকল মানুষ সংঘবদ্ধভাবেই জীবন যাপন করে চলেছে। ইসলামের মহান বাণীও তাই। সকলকে জামা'আতবদ্ধভাবেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। সাংগঠনিক জীবন যাপনের জন্য তিনটি উপকরণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এক. যোগ্য নেতৃত্ব, দুই. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তথা কর্মপন্থা, তিন. নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী। এই তিনের সমন্বয়ে হয় জামা'আত বা সংগঠন। এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে জামা'আতের কল্পনা যায় না।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া যেমন জামা'আত কায়েম হয় না, ঠিক আনুগত্যহীন কর্মী দ্বারাও জামা'আত টিকে থাকতে পারে না। এ দু'য়ের সমন্বয়ই জামা'আত। যেমন হাট-বাজারে অগণিত মানুষের সমাগম হ'লেও তাকে যেমন জামা'আত বা সংগঠন বলা হয় না তেমনি মসজিদ ভর্তি হাযারো মুছল্লী একাকী ছালাত আদায় করলেও তাকে জামা'আত বলা যায় না। কেননা সেখানে নেতৃত্ব ও আনুগত্য কোনটাই নেই। যে জাতি যত সুসংগঠিত তারা তত বেশী সফল বা স্বার্থক হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের মধ্যে সফলতার বীজ লুক্কায়িত। সুতরাং প্রয়োজনের তাকীদেই মুসলিম উম্মাহ্‌কে জামা'আতবদ্ধ তথা সাংগঠনিক জীবন যাপন করা সময়ের অপরিহার্য দাবী। বর্তমানে মুসলিম জাতির দুরবস্থাই প্রমাণ করে মুসলিম ঐক্যের আবশ্যকতা। আলোচ্য নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হ'ল-

(১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরয

(ক) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ : পবিত্র কুরআনে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব বর্ণনায় বেশ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, -وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। অত্র আয়াতে ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর ঐক্যের মাপকাঠি হিসাবে পবিত্র কুরআনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করে।[১৬] এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার

---

* এম.এ. আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৬. হাফিয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, তাহক্বীক্ব: মুছত্বফা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ও তার সাথীগণ (রিয়ায: দারুল আলামিল কুতুব, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৪।

করবে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। তৃতীয়টি হচ্ছে, তোমরা মুসলিম বাদশাদের সহায়তা করবে'।[১৭] অত্র হাদীছে আল্লাহর পসন্দনীয় কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল শক্তভাবে আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআনকে আঁকড়ে ধরে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করা এবং বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন থেকে বেঁচে থাকা। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎ কর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

স্মর্তব্য যে, প্রত্যেকের উপরেই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী হক্বের দাওয়াত দেওয়া ফরয। তথাপি একটি বিশেষ দল এ কার্যে লিপ্ত থাকা প্রয়োজন।[১৮] মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে একটি দল বা জামা'আতকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন একক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করা হয়নি। একজন ব্যক্তি নিয়ে একটি দল বা সম্প্রদায় হয় না। এর জন্য বেশ কিছু মানুষের প্রয়োজন হয়। যখন কিছু মানুষ একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন সেটা জামা'আত হয়।

পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সাংগঠনিক জীবন-যাপনের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে। সেখানে এর সুফলও জানা যায়। জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন মহান আল্লাহ মানব জাতিকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।[১৯]

(খ) মহানবী (ছাঃ)-এর নির্দেশ

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হ'ল-যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানাল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম।[২০] এ হাদীছে মহানবী (ছাঃ)-এর পাঁচটি নির্দেশের প্রথম তিনটিই সরাসরি জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া পঞ্চমটিতেও একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

(গ) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনে ছাহাবীগণের শপথ

ইসলামের সোনালী যুগে ছাহাবায়ে কেরাম সর্বাবস্থায় জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট শপথ নিয়েছিলেন। উবাদাহ ইবনু ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, আমরা আমীরের আদেশ শুনব ও মেনে চলব, কষ্টে হৌক স্বাচ্ছন্দ্যে হৌক, আনন্দে হৌক অপসন্দে হৌক, আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেয়ায় হৌক। বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'আমীরের মধ্যে প্রকাশ্যে কুফরী না দেখা পর্যন্ত (এই আনুগত্য চলবে) যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হ'তে তোমাদের নিকটে নির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে।[২১]

সার কথা হ'ল, ছাহাবীগণ শপথ করে ছিলেন যে, সর্বাবস্থায় তাঁরা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করবেন। নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করবেন না। ভাল কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করবেন। মহানবী (ছাঃ)-

---

১৭. ছহীহ মুসলিম, (রিয়াযঃ দারুস সালাম, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০০ খৃঃ), 'বিচার' অধ্যায়, হা/৪৪৮১।
১৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-৩৮।
১৯. আহমাদ, ত্বাবারানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৫৭৩৭।
২০. আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত, 'ইমারত' অধ্যায়, হা/৩৬৯৪।
২১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৬৮; মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায়, হা/৩৬৬৬।

কে সাহায্য করবেন ও তাঁর নিরাপত্তার ক্রটি করবেন না। সদা সত্য কথা বলবেন এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরওয়া করবেন না।

(২) জামা'আত বিহীন জীবন জাহেলী জীবনের শামিল

ইসলামী জামা'আত হ'তে বিচ্ছিন্ন থাকা কোন মুসলিমের জন্য উচিত নয়। কেননা বিচ্ছিন্ন জীবনকে মহানবী (ছাঃ) জাহেলী জীবন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কেউ তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কিছু দেখে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি ইসলামী জামা'আত বা সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'ল, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল'।[২২]

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি মুসলিম জামা'আত হ'তে বের হয়ে গিয়ে একাকী জীবন যাপন করে এবং সে অবস্থায় মারা যায় তবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর ন্যায়। সেকারণ কোন মুসলিম ব্যক্তির জামা'আত হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপনের কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেক মুসলিমকেই হক্বপন্থী জামা'আতের সাথে শামিল হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এটাই ইসলামের চূড়ান্ত দাবী।

(৩) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব

মহানবী (ছাঃ) জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছেন তাতে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্বও বর্ণিত হয়েছে। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন তিন ব্যক্তি তারা (জনবহুল) গ্রামে থাকুক অথবা জনবিরল অঞ্চলে থাকুক, তাদের মধ্যে ছালাতের জামা'আত কায়েম করা হয় না, নিশ্চয়ই তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং অবশ্যই তুমি জামা'আত কায়েম করবে। কেননা নেকড়ে বাঘ সেই ছাগল-ভেড়াকেই খায় যে দল ছেড়ে একা থাকে'।[২৩]

এখানে মহানবী (ছাঃ) একটি তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরেছেন। যদিও তা ছালাতের জামা'আত সংক্রান্ত। তবুও এর মধ্যে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্বের বিষয়টি নিহিত আছে। সাধারণত নেকড়ে বাঘ বা হিংস্র প্রাণী সে ছাগল বা ভেড়াকে আক্রমণ করে যে স্বীয় দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে একাকী পেয়ে খুব সহজেই ধরাশায়ী করে এবং খেয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তারা সকলে দলবদ্ধ হয়ে থাকে তাহ'লে হিংস্র প্রাণী সে দলে আক্রমণ করতে সাহস পায় না। তাই মানুষ যদি একাকী জীবন যাপন করে তাহ'লে শয়তান তাকে সহজেই বিপথগামী করার সুযোগ পায় এবং তা করেও ফেলে। আর সংঘবদ্ধ থাকলে শয়তান সে সুযোগ পায় না। কেননা তখন কেউ ভুল করলে অন্যরা তাকে সংশোধন করে দেয়।

(৪) লক্ষ্যহীন জামা'আত জাহেলী জীবনের অন্তর্ভুক্ত

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে এমন জামা'আতের অনুসরণ করতে হবে যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। সাথে সাথে তা হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ সমর্থিত। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) মহানবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে জাহেলিয়াতের সাথে মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্রপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা থাকে না) আর তাতে সে নিহত হয়, তাহ'লে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে ভালমন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে, মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করে না, সে আমার উম্মত নয়; আমিও তার কেউ নই'।[২৪] সুতরাং পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, অবশ্যই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে পবিত্র

---

২২. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৯০; মিশকাত হা/৩৬৬৮।
২৩. আহমাদ, নাসাঈ, সুনানু আবীদাউদ, তাহক্বীক্ব: নাছিরুদ্দীন আলবানী, সনদ হাসান, হা/৫৪৭; মিশকাত হা/১০৬৮।
২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৮৬।

কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক পরিচালিত জামা'আতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে হবে। যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অস্পষ্টতা এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী নীতি-আদর্শ প্রকাশ পাবে সে সব জামা'আত ও সংগঠনে যোগদান করা যাবে না। স্রেফ গোত্রপ্রীতি বা দলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করা, এরূপ দলকে সাহায্য করা এবং এ পথে মানুষকে আহ্বান করাও যাবে না।

(৫) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে পরিচালিত মুসলিম জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে থাকা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যমও। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার ছাহাবীগণকে সম্মান কর। কেননা তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক। অতঃপর তৎপরবর্তী লোক (তাবেঈ), অতঃপর তৎপরবর্তী লোকদেরকে (তাবে তাবেঈ)। এর পর মিথ্যার আবির্ভাব ঘটবে। এমনকি কোন ব্যক্তি (স্বেচ্ছায়) কসম করবে, অথচ তার নিকট কসম চাওয়া হবে না। সে সাক্ষ্য দিবে, অথচ তার নিকট হ'তে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান! যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন জামা'আতকে ধরে রাখে। কেননা শয়তান সে ব্যক্তির সাথে থাকে, যে জামা'আত হ'তে পৃথক থাকে'।[২৫]

অতএব একথা স্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি জান্নাত লাভের আশাবাদী হ'তে চাইলে তাকে অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। কেননা শয়তান ঐ ব্যক্তির উপর আক্রমণ চালায় যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে পৃথক থাকে। আর যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে তাদের থেকে শয়তানও দূরে অবস্থান করে।

(৬) একাকী হ'লেও হক্বের উপর অটল থাকতে হবে

মানুষকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে। কোন কারণে হক্বপন্থী দল পাওয়া না গেলে একা হ'লেও হক্বের উপর অটল থাকতে হবে। ভ্রান্ত দলের সাথে থাকা যাবে না। 'হুযায়ফা (রাঃ)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'তোমরা মুসলিম জামা'আত ও তার ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোন জামা'আত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি সমস্ত (ভ্রান্ত) দল থেকে আলাদা থাকবে, যদিও তুমি একটি বৃক্ষমূল দাঁত দিয়ে আঁকড়ে থাক এবং এ অবস্থায়ই মৃত্যু তোমার সন্নিকটে পৌঁছে যায়'।[২৬]

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও যদি হক্বপন্থী মুসলিম জামা'আত ও আমীরের সন্ধান পাওয়া না যায় তবুও কোন বাতিল দলের সংস্পর্শে যাওয়া যাবে না। বরং তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। যদিও একাকী কোন নির্জন বন-জঙ্গলে গাছের শিকড় আঁকড়ে থাকতে হয়। তবুও বাতিল ফের্কা বা দলের সাথে মেশার চেয়ে সেটিই ভাল হবে।

সমাপনী : মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এখন সময়ের মৌলিক দাবী। মুসলিম ব্যক্তির জন্য জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের বিকল্প কোন পথ ইসলামী শরী'আতে নেই। কোন ব্যক্তিই কোন অজুহাত দেখিয়ে মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। সাথে সাথে শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত পাশ্চাত্যের নীতি বা আদর্শের ধ্বজাধারী দলের অনুসরণেরও কোন সুযোগ নেই। সকল মুসলিম ব্যক্তিকে দলমত নির্বিশেষে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মর্মমূলে জামা'আতবদ্ধ হয়ে দুর্বার মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। প্রগতির নামে বিজাতীয় মতবাদ কিংবা ইসলামের নামে মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদের উর্ধ্বে উঠে অহি-র স্বচ্ছ প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনই মুক্তির চিরন্তন পথ। যতদিন আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্কে ঐক্যের মাপকাঠি ও সকল মত-পথের উর্ধ্বে স্থান করে দিতে না পারব ততদিন আমরা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথের দিশা পাব না, এটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের সকলকে হক্বপন্থী মুসলিম জামা'আতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

---

২৫. মুসনাদে আহমাদ, সনদ ছহীহ, হা/১১৪ ও ১১৭৭, পৃঃ ১/১১৬ ও ১৭৬; নাসাঈ, হা/৩৮০৯; মিশকাত হা/৬০১২।
২৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৮৪; মিশকাত হা/৫৩৮২।

ছাত্র সংগঠন হিসাবে আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রয়োজনীয়তা

-মুযাফফর বিন মুহসিন[*]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: নব্য জাহেলিয়াতের আগ্রাসন থেকে তরুণ ছাত্র সমাজকে মুক্ত করে মহা কল্যাণের অগ্রযাত্রায় শামিল করার লক্ষ্যে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব **১৯৭৮** সালের ৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল- 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা; আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য'। পাঁচটি মূলনীতি: (১) কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা (২) তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন (৩) ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ (৪) সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ এবং (৫) মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ। চারদফা কর্মসূচী: (ক) প্রচার (খ) সংগঠন (গ) প্রশিক্ষণ এবং (ঘ) সমাজ সংস্কার।

উক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর আলোকে এক বাক্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর চূড়ান্ত দাবী- 'আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।'

মানবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আল্লাহ প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) দীর্ঘ কন্টকাকীর্ণ পথ পরিক্রমার পর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্ব ইতিহাসের সর্বোন্নত একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ। সেই সমাজ যাবতীয় কল্পিত দর্শন মুক্ত ছিল। সেখানে ছিল কেবল এলাহী দর্শন। তাঁর এই যাত্রাপথে সর্বাধিক ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মহাবিপ্লবী তরুণ সমাজ। তরুণ ছাত্র সংগঠন হিসাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ধর্মের নামে যাবতীয় কল্পিত দর্শন এবং প্রগতির নামে উদ্ভূত নব্য মতবাদের মূলোৎপাটন করে আল্লাহ প্রদত্ত দর্শন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালায়।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও অন্যান্য সংগঠন :

অন্যান্য সংগঠন ইসলামী হোক বা অনৈসলামী হোক প্রত্যেকটিই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রচিত থিওরী বা দর্শনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত। স্ব স্ব অনুসারী তারই ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে, প্রচারণা চালায় এবং তার দিকেই মানবতাকে আহ্বান জানায়। অনৈসলামী দলগুলোর কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, কেউ জাতীয়তাবাদ, কেউ সাম্যবাদ ইত্যাদি বিধর্মীয় মতবাদের সাথে জড়িত। ইসলাম এগুলোকে অনুমোদন করে না। কারণ কালমার্কস মহান স্রষ্টা আল্লাহকে অস্বীকার করে বলেছেন, It is not religion that creates man but man who creates religion. Religion is the groan of the down frodden creature. It is the opium..... the idea of God must be destroyed. 'ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি, মানুষই ধর্মকে সৃষ্টি করে নিয়েছে। ধর্ম নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর মূর্ত আর্তনাদ। এটা আফিম... সুতরাং আল্লাহ্র কল্পনা মানুষের মন থেকে উৎখাত করতে হবে'। তার সহচর এঙ্গেলস বলেন, The first world of Religions a lie. ধর্মের প্রথম শব্দটাই মিথ্যা (আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস)।

অনুরূপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হ'ল ধর্মহীনতাবাদ। ধর্ম বিবর্জিত জীবনধারা অবলম্বনই হচ্ছে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' (Secularism)। Encyclopaedia Britannica- তে ' সেকিউলারিজম'-এর সংজ্ঞায় তারাই বলেছেন , A movement in society disected away from other worldliness to this worldliness. In the medieval period there was a strong tendency for religious persons to despise human affairs and to meditate on God and the after life. অর্থাৎ 'এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে পরকাল থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র দুনিয়াবী জীবনের প্রতি নির্দেশ করে। যা মধ্যযুগে (শেষের দিকে) ধার্মিক ব্যক্তির স্বীয় কর্মের প্রতি এবং ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি তাচ্ছিল্যের প্রবণতা তীব্রভাবে সূচনা করে'। আর জাতীয়তাবাদের যে ৬টি উপাদান রয়েছে তা থেকে ধর্মকে উৎখাত করা হয়েছে। যথা বংশ, অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক ঐক্য ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্য। অনুরূপ গণতন্ত্রের যে আবেদন তা আল্লাহর সৃষ্টি কোন মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। যেমন- Democracy is Government of the people by the people and for the people. 'গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের শাসনব্যবস্থা'। তাহলে মানুষের তৈরি আইন কিভাবে মানুষ মানবে? সে তো একমাত্র আল্লাহ্র আইন মানবে। অতএব কোন মানুষই উক্ত বিধর্মীয় মতবাদগুলোর সাথে জড়িত থাকতে পারে না।

অন্যদিকে দেশে প্রচলিত ইসলামী দলগুলোর অধিকাংশই ইমামের রচিত কথিত মাযহাবের অনুসারী, যা নিজেদের উপর তারা ফরয করে নিয়েছে। অতঃপর বহু মানুষ দরগাহ, খানকাহ, মাযারে পূজিত পীর ও বাবার অনুসারী,

---

[*] সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

কেউ স্বপ্নে পাওয়া তরীকা ইলিয়াসী তাবলীগপন্থী। কেউ শরী'আত, তরীকত, মা'রেফত, হক্বীক্বত, কেউ ক্বাদারিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, নকশাবন্দীয়া ইত্যাদি কথিত ধর্মীয় মতবাদের সাথে জড়িত। এগুলোও মূল ইসলাম থেকে অনেক দূরে।

পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণ উক্ত ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় প্রকার মতবাদকে ছুড়ে ফেলে কেবলমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অহির বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতি আহ্বান জানান। যেমন আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) বলেন, 'প্রত্যেক দলই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার দিকেই তারা প্রত্যাবর্তন করে অথবা রায় বা নিজস্ব অভিমতকে উত্তম মনে করে এবং তার উপরই অটল থাকে; কেবল আহলেহাদীছগণ ছাড়া। কারণ আল-কুরআন তাদের মূল হাতিয়ার, সুন্নাহ্ তাদের আসল দলীল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দলনেতা এবং তাঁর দিকেই তাদের সম্বন্ধ। তারা মনোবৃত্তির উপর বিচরণ করেন না এবং রায়ের দিকেও ভ্রূক্ষেপ করেন না' *(শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৮)*। অনুরূপ বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠবিদ্যাপীঠ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ বলেন, 'আহলেহাদীছ তারাই যারা তাক্বলীদের বন্ধনকে স্বীকার করেন না; বরং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই একজন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির জন্য যথার্থ পথপ্রদর্শক বলে মনে করেন'।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ যুবসংঘ :

অধুনিক বিশ্ব তথাকথিত প্রগতির জোয়ারে ভাসমান। যেখানে শুধু অশান্তি-অপশাসন, অন্যায়-অত্যাচার, হানা-হানি ও রক্তের হোলিখেলা চলছে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্বত্রই চলছে মিথ্যা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির জয়জয়কার; অস্থিরতা, সাম্রাজ্যবাদ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, জবরদখল ইত্যাদি এগুলোর মূল প্রতিবাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উক্ত দুর্গন্ধময় স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত বিশ্ববিজয়ী সেই আদর্শের দিকেই আহ্বান জানিয়ে আসছে স্বর্ণযুগ থেকে। ইনশাআল্লাহ এই ধারাবাহিকতা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সেই আদর্শ ছাড়া বিশ্বে প্রকৃত শান্তি সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। উক্ত সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিকল্প কিছু নেই। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যে আদর্শের আহ্বায়ক তার কাছে বিশ্বের প্রতাপশালী শাসকরা মাথানত করেছে। নমরূদ, ফেরাউন, হামান, কারূণ, আবু জাহল, আবু লাহাবের দাপট খর্ব হয়েছে। রূম ও পারস্য সাম্রাজ্য পদচুম্বন করেছে মুহাম্মাদী আদর্শের। আধুনিক বিজ্ঞানও তার কাছে শির নত করেছে। তাই মুহাম্মাদী আদর্শের দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর সেটাই চায় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পণ্ডিতগণ বলেন, The Ahle hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity to faith and practices. 'আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের নীতি সমূহের দিকে ফিরে যেতে চান এবং আক্বীদা ও আমলের মৌলিক সরলতা ও স্বচ্ছতাকে পুনরুদ্ধার করতে প্রচেষ্টা চালান'। এক্ষণে আমরা দুইটি মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করতে চাই-

মূল প্রতিপাদ্য :

(ক) অনুসরণীয় সংবিধান বা মানদণ্ড : বিশ্বশান্তির কোন পথ খুঁজতে হ'লে নিরপেক্ষাভাবে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধান ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রচারিত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকেই। হোক তাদের সংখ্যা অত্যল্প। তারাই যদি সেই আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তাহলে বিশ্ব আবারও সেই আদর্শের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। টমাস কার্লাইল ১৮৪০ সালে এডিনবার্গে আয়োজিত সভায় যে ভাষণ দান করেন তার শিরোনাম ছিল "On Heroes, Hero Worship and Heroic in History: Hero as Prophet". উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, A poor shepherd people roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world. A Hero Prophet was sent down to them with a world they could believe. See the unnoticed becomes world noticeable, the small has grown world great; Within one century afterwards Arabia is at Grannada this and Delhi on that. 'আদিকাল হতে এই আরবজাতি মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করত এক অজ্ঞাত, অখ্যাত মেষ পালক জাতি হিসাবে। তারপর তাদের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমন শাশ্বত বিধানসহ এক ধর্মবীর নবী প্রেরিত হলেন। আর তখনই সেই অখ্যাত জাতি হয়ে উঠল জগদ্বিখ্যাত। দ্বীনহীন জাতি হয়ে উঠল জগৎশ্রেষ্ঠ। অতঃপর এক শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম গ্রানাডা থেকে পূর্ব দিল্লী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হল আরবের আধিপত্য'।

(খ) তারুণ্যের জাগরণ : এই আদর্শের ঝাণ্ডাবাহী হতে হবে একদল নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী মেধাবী তরুণ সমাজকে। যেভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর আদর্শ সমাজ। যুবকদের মাধ্যমেই মদীনার রাষ্ট্রীয় ভীত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১১ নববী বর্ষে মদীনা থেকে হজ্জ করতে এসেছিলেন সর্বকনিষ্ঠ তরুণ আস'আদ বিন যুরারাহর নেতৃত্বে পাঁচজন তরুণ। আর তাদেরই ফসল হয়ে উঠল বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা যা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। আহলেহাদীছ যুবসংঘ হোক সেই তরুণ কাফেলার মহান উত্তরসূরী।

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যুবকদের ভূমিকা

মুকাররম*

হাশরের ময়দানে যখন কারো মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে না, ঠিক সেই সময় সাতশ্রেণীর মানুষের জন্য বিশেষ ছায়ার ব্যবস্থা থাকবে। তাদের দ্বিতীয়জন হল আদর্শ যুবক। আবু বকর, ওমর, ওছমান, হামযাহ (রাঃ)-এর মত সম্মানিত ও সাহসী ছাহাবীগণ থাকতে রাসূল করীম (ছাঃ) যুবক হযরত আলী (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আলী! তুমি ছাড়বে না কোন উঁচু কবর, তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে, তুমি ছাড়বে না কোন মূর্তি ভেঙ্গে খান খান করে দিবে'। খায়বারের ময়দানে অন্যান্য বীর সিংহ পুরুষ থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ আলীকেই রাসূল (ছাঃ) বিজয়ের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) একজনকে উপদেশ স্বরূপ বলেছিলেন, পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে মূল্যায়ন করার জন্য। তার মাঝে প্রথমটিই হল যৌবনকে প্রাধান্য দাও বার্ধক্য আসার পূর্বে।

যৌবনের গৌরব প্রকাশ করতে যেয়ে বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও বলেছেন, যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে- যাহারা বৈমানিকরূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিস্কারকরূপে নব পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিলসমাধি লাভ করে। অসাধ্য কাজকে যারা জয় করে তারাই তো যুবক। কিয়ামাতের দিন ৫টি প্রশ্নের জবাব না দিলে এক ধাপ সামনে বাড়া যাবে না। তার মধ্যে প্রথমটি হল তোমার যৌবনকাল কিভাবে কাটিয়েছো। সুতরাং যুবকদের উপর সমাজের জন্য করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য কোনভাবেই সীমিত নয়। উপমহাদেশে স্বাধীনতার ইতিহাস, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিটি স্তরেই যুবকদের ভূমিকা সর্বাগ্রে।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতার চূড়ান্ত ধ্বস নেমেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে সুনীতি বলতে যেন কিছুই অবশিষ্ট নেই। সর্বত্র দুর্নীতির জয়জয়কার। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও মাস্তানদের অত্যাচারে সর্বস্তরের মানুষ আজ অতিষ্ঠ। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কবির আক্ষেপে সুর মিলিয়ে বলতে হয়-

পাপাচার আর ব্যাভিচারে + ছেয়ে গেছে আজ সারা দুনিয়া
নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে + বেড়েই চলেছে সূদ, ঘুষ আর মদ জুয়া।

আজ শান্তির দিকে তীর্থের কাকের মত চেয়ে আছে বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষ । কে দেখাবে তাদের শান্তির পথ? মুক্তির পথ? কে তাদেরকে যালেমের অত্যাচার থেকে মুক্ত করে চির শান্তির আঙ্গিনায় নিয়ে আসবে? আল্লাহর বাণী- 'তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না? দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর যার অধিবাসী অত্যাচারী' *(নিসা ৭৫)*। এ অবস্থায় একজন মুসলিম যুবক কি বসে থাকতে পারে? এ সব ঘটনার কি নিরব সমর্থন জানাতে পারে? বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যই আল্লাহ পাক মুসলমানদের উত্থান ঘটিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সেই ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস রাখবে' *(আল-ইমরান ১১০)*।

সমাজ ও পৃথিবীকে সুন্দর রূপে গড়ে তোলার জন্য যুবকদের অংশীদারিত্ব একান্ত অপরিহার্য। দিকভ্রান্ত জনতা আজ তাকিয়ে আছে যুবসমাজের দিকে। তাই আর অলসতা নয়। জেগে উঠো হে যুবক! গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াও, দেখ তোমার পানে চেয়ে আছে অধিকারবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, নির্যাতিত মানবতা। সকল প্রকার বাঁধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যালেমের যুলুমকে রুখতে হবে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সর্বশক্তি নিয়োগ করে সত্য ও ন্যায়ের প্রসারে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর মশাল হাতে নিয়ে খুঁজে বের করতে হবে সঠিক পথের দিশা। মনে রেখ 'সত্যের জয় সুনিশ্চিত আর মিথ্যার ক্ষয় অবধারিত'।

'হে তরুণ ছাত্র সমাজ! ক্লান্তিহীন চেতনায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলো মহা সত্যের সন্ধানে'!!!

* বি.এ. (অনার্স), ৪র্থ বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ছাত্র রাজনীতি : প্রাসঙ্গিক আলোচনা

-মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান *

এখন যৌবন জোয়ার যার

....

পরের লাইনের রচিয়তা যখন সাড়ে চৌদ্দ কোটি জনতা। তখন রাসূল (সাঃ)-এর বাণী মুসলিমের ছোট্ট দেশটিতে কোথায় যে পালিয়ে বাঁচবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। মানুষ জন্মগতভাবে জৈবিক ও রৈপিক ক্ষমতা অর্জন করে। আর যে ক্ষমতা অর্জনের জন্য সারা জীবন কেটে যায় তা হ'ল নৈতিক। জৈবিক ক্ষমতাবান জীবসত্তা বিশিষ্ট মানুষ নৈতিক ক্ষমতাবান মানব সত্তাতে পরিণত হবে এটাই তার সৃষ্টির মূল কথা। সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর মতে, জীবসত্তা যখন একটি দোতলা ঘরের নীচ তলায় তখন মানব সত্তা দোতালায় অবস্থান করে। কেউ যদি উপরে উঠতে চায় তাকে একটি মই ব্যবহার করতে হবে। তার ভাষায় এটি শিক্ষা। যাই হোক আত্মিক ও জৈবিক চাহিদার সর্বোত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে মানবতার সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধনই সেই নৈতিকতার ফসল, যা শিক্ষার মূল দর্শন।

যে শেখে সেই ছাত্র। শেখ সাদীর ভাষায় প্রতিটি ছাত্রই একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখা। যাকে জ্বালাতে হয়, নতুবা নিভাই নিভাই করে অবশেষে নিভে যায়। এখন প্রশ্ন হ'ল তাকে কে জ্বালাবে, কোথায় জ্বালাবে, কিভাবে জ্বালাবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষানীতির আবির্ভাব। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে সেকালের বিক্রমশীল বিহার বা সোমপুর বিহার আজ মাদরাসা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। অবকাঠামোগত পার্থক্য যাই হোক না কেন কাঠামোগুলো মানবসত্তা অর্জনের লক্ষ্যে মেধা পরিচর্যার ক্ষেত্র বলে পরিচিত, যা হ'ল শিক্ষাঙ্গন। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য এ শিক্ষাঙ্গনে আগমন করেন। শিক্ষাবিদ আবুল ফযল এর ভাষায়, 'শিক্ষাঙ্গন হচ্ছে সুনাগরিক গড়ার কারখানা। এখানে কোন কিছু ত্রুটি হ'লে জাতিকে পঙ্গু না করে ছাড়বে না'। কিন্তু অতিসয় করুণ বাস্তবতা এই যে, বিশৃঙ্খলা আর অনিয়মের দাবানল শিক্ষাঙ্গনের প্রতিটি রন্ধ্রকে প্রতিনিয়ত দাহন করছে। যার নেপথ্যে অন্যতম এবং প্রধান কারণ ছাত্র রাজনীতি।

এইতো ক'দিন আগের কথা, ট্রেনের যে কামরায় দু'টো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র থাকত, কোন অভিভাবক তার মেয়েকে নিয়ে সে কামরায় উঠতে নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু আজ সে অভিভাবক সর্বোচ্চ শঙ্কায় সময় কাটায়, যদি তার কামরায় কয়েকটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র থাকে। নীতি আর আদর্শের অভাবে শিক্ষাঙ্গনে আজ খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ, মাদকতা, জুয়া লটারি, ব্যভিচার ইত্যাদি যেন শিক্ষার একটি অংশ হয়ে পড়েছে। এসব অবক্ষয়ের জন্য পুরোটাই দায়ী ছাত্র রাজনীতি তা বলব না। তবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষাভাবে অনেকাংশে দায়ী নয় কি? আসুন ভেবে দেখি-

মেধা লালনকারীরাই ছাত্র। আর রাজার রাজ্য চালানোর নীতিই রাজনীতি যেহেতু The student are the future leaders of the country who could fulfil country's hopes being capable. কাজেই ছাত্র রাজনীতি চর্চার সাথে জড়িত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেশ দুর্নীতিতে প্রথম সারিতে অবস্থানের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে, সে দেশের ছাত্র, তার দেশে নীতি নির্ধারক ও তাদের প্রণীত নীতির অনুসরণ করবে নাকি সংস্কার করবে সেটা দেখার বিষয়। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে অদ্যবাধি মহান আদর্শকে সামনে রেখে যতগুলো সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে ছাত্র সংগঠন অন্যতম। লেখা পড়ার পাশাপাশি দেশবরেণ্য ছাত্র সমাজ তাদের নিজের ও দেশ মাতৃকার সাথে সংশ্লিষ্ট শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে ভূমিকা পালন করে তাই ছাত্র রাজনীতি। ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে ছাত্ররা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। কিন্তু দেশের রাজনীতি যখন রোগাক্রান্ত আর দুর্গন্ধ ছড়াতে ব্যস্ত তখন ছাত্র রাজনীতি বিতর্কের সাগরে হাবুডুবু খাবে এটাই স্বাভাবিক।

বর্তমানে প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে তাদের অনৈতিক কার্যকলাপের স্থায়িত্ব টিকিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত। এদিকে কোমলমতি ছাত্ররা দিশেহারা হয়ে কিছু সুবিধা ভোগের ভিত্তিতে তাদের প্রধান কর্তব্যগুলো ভুলে গিয়ে অন্তঃসারশূন্য শ্লোগানে প্রলুব্ধ কণ্ঠ মিলিয়ে শিক্ষাঙ্গনে গড়ে তুলেছে ত্রাসের রাজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে হলগুলো আজ বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রদের মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের পৈশাচিক উন্মাদনা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

---

* উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ৪র্থ বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত বটি বা ছুরি তৈরি হচ্ছে একটু ভিন্ন ছাঁচে এবং সাইজে। স্বার্থের ব্যঘাত ঘটলেই তা গিয়ে পড়ছে আর এক ভাইয়ের বুকে। ফলে ছিন্নভিন্ন দেহ হ'তে রক্তের ধারা চোখের সামনে আছড়ে পড়ছে। নিভে যাচ্ছে জ্ঞানের দীপশিখা। খালি হচ্ছে মায়ের কোল। হে বস্তাপচা রাজনীতি! তুমি কি পারবে শূন্য মায়ের বুক পূর্ণ করতে? তোমার সমবেদনায় মায়ের সাময়িক প্রলাপ বন্ধ হয় হয়তো কিন্তু হৃদয়ের হু-হু শব্দ আল্লাহ্‌র আরশকে কিভাবে কাঁপায় তা তোমার কল্পনাতেও আসে না। রাত্রে জ্ঞান চর্চার পরিবর্তে ছাত্ররা আজ অশ্লীল, গীবত ও তোহমত পূর্ণ ভাষণ চর্চা করে। শিক্ষাঙ্গনের বিভিন্ন জায়গায় টেন্ট গড়ে প্রলাপ বকছে প্রতিদিন। তাজা প্রাণ ঝরে যাওয়া অথবা পঙ্গুত্ব বরণ এখন ছাত্রদের ভাগ্য খাতায় নতুনভাবে লিখিত হচ্ছে। কেউ আবার প্রগতির নামে রাজনীতির আশ্রয়ে গড়ে তুলেছে প্রগতিশীল সংগঠন। মিছিলে মেয়েদের চিৎকার দেখে লজ্জায় মুখ লুকায় শিক্ষাঙ্গনের গাছপালা। ডাইনিং-ক্যান্টিনে ভাত নিয়ে মারামারি, থুথু ফেলাকে কেন্দ্র করে তাজা রক্তের প্রবাহমান স্রোত, সিট দখলকে কেন্দ্র করে অস্ত্রের ঝনঝনানি এখন নিত্যদিনের রুটিন। ফলে খবরের পাতায় শিরোনাম হচ্ছে রাবি উত্তাল, অধ্যাপক খুন, রাবি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ, অচল দিনাতিপাত করছে রাবি, হরতাল আজ, ধর্মঘট চলবে পাঁচ দিন, তালা ঝুলছে ক্লাস রুমে, আতঙ্কের মাঝে শিক্ষার্থীরা ইত্যাদি। দুঃখজনক হ'লেও সত্য এসকল ছাত্রদের মদদ দিচ্ছে এক শ্রেণীর শিক্ষক, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা। ফলে জাতি আজ এগিয়ে যাচ্ছে চরম মেধা শূন্যতার দিকে। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী যেখানে সিট না পাওয়ায় কোন লাইব্রেরীতে ১৬ ঘন্টা দাঁড়িয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন সেখানে আমাদের ছাত্রদের সিগারেটের ধোয়ামুখর পরিবেশে গম্ভীর মুখ দেখলেই বোঝা যায় জাতির ভবিষ্যৎ।

৪৭, ৫২, ৫৯, ৬৯, ৭১-এ ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা পুরোপুরি ম্লান করে দিয়েছে আমাদের বর্তমান ছাত্র রাজনীতি। ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারার সুবিধা এখন কারো কাম্য নয়। পড়তে পড়তে পৌঁড় তবু পড়া আর শেষ হয় না। এ সকল আদু ভাই এখন ছাত্রনেতা। একদল বখাটে ছাত্র তার সহকর্মী। সারাদিন দলবল সহকারে এখানে সেখানে শো-ডাউন তাদের কর্মব্যস্ততা। মুখে সিগারেট, পকেটে পিস্তল, মানিব্যাগে টাকা পাচ্ছি ভাই, বল আর কি চাই?

শেখার মাঝে হরতাল, অবোরধ এ আবার কেমন জাতি। শিক্ষক দিবেন সঠিক শিক্ষা, তিনি আবার ডানপন্থী, বামপন্থী অথবা উল্টাপন্থী, তাহ'লে জাতির পন্থা হবে কী? জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আজ বলতে চাই- হে ছাত্র সমাজ আসুন! নিজের বিবেককে জাগ্রত করি। জীবনের এ গোল্ডেন সময় যৌবন জোয়ারকে সঠিক পথে পরিচলিত করি। এখন সময় এসেছে সেই রাজনীতি করার, যে রাজনীতি প্রচালিত নোংরা আর ত্রাসের রাজনীতিকে সংস্কার করে, দেশ আর সৃজনশীলতার প্রতি কর্তব্যমুখী করে তোলে। Evrey time an intellectual has the chance to speak out against injustice, and yet remains silent, he contributes to the moral paralysis and intellectual barreness that grips the affluent world (F. Laski).

বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের ছাত্র ভাইদের প্রতি অনুরোধ আরেকটি কৌশলের নামে সুন্নাতকে কুরবানী করবেন না। হারামকে মাকরূহ বলে সুবিধা নেওয়া বন্ধ করুন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতিতে রাসূল (ছাঃ)-এর নীতি প্রয়োগ করুন। খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচনে আপোষকামীতা দেখিয়ে ইসলামকে সংকীর্ণ করবেন না। জিহাদ ও কিত্বাল-এর মাঝে পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করুন। অন্যের হক্ব নষ্ট করার অধিকার ইসলাম আপনাকে দেয়নি। আপনার আচরণই সেকুল্যারদের আরো বেশি সেকুল্যার করেছে, তাই নয় কি? নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভেবে দেখুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা, দয়া, মায়া, ক্ষমা, আর হাসিমাখা মুখখানি ইসলাম প্রচারের বড় পাথেয় ছিল। আক্বীদার সংশোধন ছাড়া নীতি কার্যকর হয় না, কথাটি ভুলে গেছেন কি?

হে শিক্ষার্থী বন্ধু! আসুন আল্লাহ প্রদত্ত বড় নে'মত বিবেককে জাগ্রত করে মনুষ্যত্ব বিকাশ করি। এর মাধ্যমে গড়ে তুলি সেই ছাত্র রাজনীতি যা স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে দিবে। আমার যোগ্যতার ভিত্তিতে আমাকে হলের আবাসিকতা দিবে, আমার মেধার ভিত্তিতে আমাকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিবে। আমার বাবার ঘাম ঝরানো ক্লেশ হ'তে নিংড়ানো করের টাকায় যে প্রশাসন চলে, সে আমাকে আর তাদের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার বরং আমার পাওনা সকল অধিকার ফিরিয়ে দিবে। আদর্শ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে তা আমাকে গড়ে তুলবে আদর্শ নাগরিক হিসাবে। যার ফসল হিসাবে আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হবে মহৎ গুণাবলীর স্রোতধারা। ভাইকে দেখলে ভরে উঠবে ভাইয়ের বুক। দূরীভূত হবে ত্রাস। আবহমান থাকবে জ্ঞানের রাজ্য। সৃজনশীলতার পারঙ্গমতা প্রকাশে সবাই হয়ে উঠবে প্রতিযোগী। শান্তির নিঃশ্বাস ফেলবে প্রতিটি মায়ের বুক। দেশমাতৃকা জাগ্রত হবে গৌরবে তাজ নিয়ে। আর সে লক্ষ্যে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর অছীয়ত অনুসারে ছাহাবায়ে কেরামের পথের ধারাবাহিকতায় আহ্বান করে যায়।- 'হে **যুবক!** তোমার প্রতি ফোঁটা রক্ত আল্লাহর দেওয়া পবিত্র আমানত। এসো তা ব্যায় করি নির্ভেজাল ইসলামী **আন্দোলনে'**। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের প্রভাব : আমাদের করণীয়

*-জিয়াউর রহমান**

আমরা বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে এসেছি। একুশ শতকের আলো ঝলমল উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আমরা নব যুগের নিত্য-নতুন প্রগতির আলোয় আধুনিক জীবনের ছোঁয়া পেয়েছি। প্রগতির এ উৎকর্ষতা জীবনে এনেছে যাবতীয় বিনোদন উপকরণ । কিন্তু আমরা কি আধুনিক সংস্কৃতির আড়ালে অপসংস্কৃতির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি না?

আমাদের দেশে এখন স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা বাড়ছে। এটি অনেকের কাছে সুখবর। কিন্তু সচেতন অভিভাবকদের, চিন্তাবিদদের ও সমাজবিদদের নিকটে এটা ভীতির কারণ। আশঙ্কা ভালর সঙ্গে মন্দের, সুস্থতার সঙ্গে অসুস্থতার, শ্লীলতার সঙ্গে অশ্লীলতার, উন্নতির সঙ্গে অবনতির। গত তিন-চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের বদৌলতে এসেছে পরিবর্তন।

স্যাটেলাইট চ্যানেল ধরার জন্য যে, ডিশ ব্যবহৃত হয় তা এখন শুধু শহরেই সীমিত নয়, সুদূর গ্রামাঞ্চলের ভবন বা উঁচু ছাদেও তা শোভা পায়। ডিশ শব্দের অর্থ থালা। শব্দটি বিশ্লেষণ করলে সঙ্গে এটোঁ বা উচ্ছিষ্টও এসে যায়। এই অর্থে বিনোদন পিয়াসী হাড় হাভাতে বাঙালীর পাতে চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক বিদেশী ভালর সঙ্গে (খারাপ) এটোঁও এসে পড়ছে। বলা হচ্ছে, আকাশ মুক্ত হয়ে গেছে, আসছে মুক্ত বাতাস। কিন্তু সেই মুক্ত বাতাসের সঙ্গে আসছে সংক্রামক জীবাণুও।

উল্লেখ্য যে, ১৮৯৫ সালে লুমিয়ার ব্রাদার্স বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে প্রথম 'আলীবাবা এ্যাণ্ড ফরটি থীভজ' (আলী বাবা চল্লিশ চোর) এবং ১৯৫৬ সালে 'মুখ ও মুখোশ' নামে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রথম বাংলাদেশে ১৯৬৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে টেলিভিশন চালু হয়। সময়ের ব্যবধানে প্রযুক্তির উন্নয়নের সাদা-কালো থেকে বর্তমানের রঙ্গীন, নীল প্রজাপতির পাখার ন্যায় রংবৈচিত্র্যে উন্নীত হয়েছে। ডিশ বর্তমান সমাজে মর্যাদার প্রতীক। গার্মেন্টসকর্মী, রিক্সাওয়ালা ও গ্যারেজকর্মীর খুপড়ি ঘরেও দেখা যায় কেবলের সংযোগ। ডিশ কি আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে, মানবীয় গুণের প্রয়াস সাধনে ইতিবাচক কল্যাণকর অবদান রাখছে?

সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ডিশ-এন্টেনা আমাদের অকল্যাণই বয়ে আনছে। কেননা বছর দশেক আগে অভিভাবকদের আশঙ্কা ছিল তাদের সন্তানরা বাইরে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বাজে কিছু দেখে কি-না। আর এখন অভিভাবকদের আশঙ্কা হচ্ছে তাদের সন্তানরা ঘরে রাখা টিভি সেটে ঐ সব দেখে কি-না। আগে ভয় ছিল বাইরের প্রেক্ষাগৃহের। কিন্তু এখন? প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবি দেখে মানুষ বিভোর-প্রভাবিত হওয়ার চেয়ে ঘরে বসে রিমোটের বোতাম টিপে ইচ্ছেমত চ্যানেল আসছে। ফলে প্রত্যেক ঘরে ঘরেই তো এখন প্রেক্ষাগৃহ হয়ে গেছে।

এছাড়া ডিশ-এন্টেনার প্রভাবে বর্তমান আমাদের জাতি তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে বিচ্যুত হয়ে সর্বোপরি নিজেদের সবকিছু আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে পশ্চিমা জগতের বস্তাপচা কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে। তাই তো চলচ্চিত্রে অভিনয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত থাকা মানেই আধুনিক সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করে। এই তন্ত্রে বিশ্বাসী হাযার হাযার যুবক-যুবতী অভিনেতা-অভিনেত্রী হবার দুরুন্ত নেশায় সকল নিয়ম-নীতির বাধা উপেক্ষা করে তাতে যোগদান করছে। বিনিময়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সম্মান, ঐতিহ্য ও মূল্যবান সকল কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

---

*এম.এ. (শেষ বর্ষ) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বোতাম টিপে আমি ঠিকই ইচ্ছেমত চ্যানেল পরিবর্তন করছি ফলে স্ক্রীনে প্রদর্শিত দৃশ্য, ঘটনা আমাদের মন-মেজায, চিন্তা-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে উপর্যুপরি ধোলাই করে আমাদের ধর্মের স্বকীয়তা, ঐতিহ্য ও আদর্শ ধ্বংসে মোক্ষম হাতিয়ার স্বরূপ কাজ করছে। ফলে আজ সত্যিই লর্ড মেকলের সেই উক্তি বাস্তবায়ন হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, We must at present do our best from a class, who may be interpreters between us and millions whom we govern a class of persons Indians in blood and colour but English in teste in openion in morals and intellect. 'বর্তমানে আমাদের অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও লাখ লাখ মানুষ যাদের আমরা শাসন করছি তাদের মধ্যে দূতের কাজ করতে পারে। এরা এমন এক ধরনের মানুষ হবে যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু মেজায, চিন্তা-চেতনায়, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'।

তাই তো মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণদানকালে বলেছিলেন, 'পশ্চিমা জগত প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছবি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রচার মাধ্যমগুলিতে শুধু বিকৃত ছবিই প্রচার করা হচ্ছে না, আমাদের উপলব্ধি-ক্ষমতাও নস্যাৎ করে দেয়া হচ্ছে। অতীতে পশ্চিমা মিশনারীগুলো দর্শন প্রচারে নিয়োজিত থাকত। বর্তমানে প্রচার মাধ্যমে আমাদের কাঙ্খিত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিচ্ছে'।

দেশে খুন, সন্ত্রাস ও ধর্ষন বৃদ্ধিতে স্যাটেলাইট চ্যানেলে পরিবেশিত বিভিন্ন চলচ্চিত্রের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব এর জন্য যেমন দায়ী তেমনি দায়ী বর্তমান সময়ে স্যাটেলাইট চ্যানেলে পরিবেশিত ছবিগুলি। আজকের সমাজে এসিড নিক্ষেপসহ নারী নির্যাতনের অগণিত কারণের পিছনে গান-বাজনা ও ব্লু-ফিল্মের কুপ্রভাব যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর শক্তি তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। সিনেমার খুন, সন্ত্রাস ও ধর্ষণের দৃশ্য দেখার পর তা মনে গেঁথে যায়। আর যারা সন্ত্রাসী মানসিকতার তারা সিনেমায় দেখা সন্ত্রাসের পদ্ধতিগুলি আয়ত্ব করে বাস্তব সমাজে প্রয়োগ করে।

এ ছাড়া টিভি দেখার অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক ডাঃ এন, ভ্যাগমর তার 'হোয়াই সাফার' নামক বইয়ে লিখেছেন, ছেলে-মেয়েরা টিভি সেটের সামনে বসে নোংরা অনুষ্ঠান দেখে, অথচ এর থেকে মানবদেহে জন্ম নেয় ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার। আমেরিকার বোষ্টান শহরে মাত্র একটি শহরে একটি হাসপাতালে ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সারে শিকার হয়ে ছ'শত ছেলে-মেয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে। 'টিভি কা যহর' নামক পুস্তিকা থেকে আরো কিছু রোগের কথা জানা গেছে। (১) টিভির অনুষ্ঠান দেখার ফলে মস্তিষ্কের শিরা ফেটে যায়। (২) টিভি দেখায় অভ্যস্ত শিশুদের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। ফলে পড়ালেখা থেকে তাদের মন উঠে যায়।

ডিশ-এন্টেনার ক্ষতিকর প্রভাব :

✪ মুসলিম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আদর্শিক স্বাতন্ত্রার বিলোপ সাধন ও সামাজিক জীবনে পরিশীলতার উচ্ছেদ।

✪ উন্নত মানসিক চিন্তা-চেতনার বৈরী প্রভাব। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা সৃষ্টি । শরীরের অভ্যন্তরে মারাত্মক রোগের উত্থান।

✪ আল্লাহদ্রোহীতে সমর্থিত হওয়া ও ভোগবাদী জীবনে নির্ভরশীলতা এবং ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে অনাগ্রহ।

✪ নৈতিক অনুভূতির বিলুপ্তি ও সৃজনশীল চেতনা বিরোধ।

✪ লজ্জাশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ, মমত্ববোধপূর্ণ আচরণের বিলুপ্তি।

✪ সামাজিক অনাচার, ব্যভিচার, ধর্ষণ, অপহরণ বৃদ্ধি।

✪ বিশ্ব শান্তি, মানবীয় ভাতৃত্ববোধ, পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতায় দ্বিমত সৃষ্টি।

✪ পবিত্র কুরআনের বাণী তাদের হৃদয়ে কোন প্রভাব ফেলে না। কুরআন ও হাদীছ থেকে কোন মজা তারা অনুভব করে না। কুরআনের গভীর তত্ত ও তথ্য তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ করে না। ফলে There is no God 'আল্লাহ বলে কেউ নেই' মন্ত্রে আস্থা অর্জন ও উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হওয়াসহ অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

ইসলামের বিধান :

ইসলাম চলচ্চিত্র ও গান-বাজনার বিরুদ্ধে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيْ أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ-

'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য মূর্খতাবশত অসার বাক্যসমূহ ক্রয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে লজ্জাকর শাস্তি। যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতেই পায়নি। যেন তার দু'কানে বধিরতা রয়েছে। আপনি তাকে মর্মান্তিক আযাবের সুসংবাদ দিন' *(লোকমান ৬-৭)*।

আয়াতে 'লাহ্ওয়াল হাদীছ' খরিদ করার কথা বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সেই আল্লাহ্‌র কসম করে আমি বলছি এর অর্থ গান, গান, গান। একই কথা বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, জাবের, হাসান বছরী, ইকরিমা, সাঈদ বিন জুবায়ের, মুজাহিদ, মাকহূল, মায়মূন বিন মিহরান, আমর বিন শু'আইব, আলী বিন নাদীমাহ প্রমুখ ছাহাবী ও তাবেঈগণ। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতসহ আরও দু'টি আয়াত *(নাজম ৬১ ও বনী ইস্রাঈল ৬৪)*-এর ভিত্তিতে বিদ্বানগণ চলচ্চিত্র ও গান-বাদ্যকে নিষেধ করে থাকেন। সুতরাং স্যাটেলাইট চ্যানেল, চলচ্চিত্র ও গান-বাজনার পিছনে শুধু অর্থ অপচয় করা নয়; বরং এটা জাহান্নামের অগ্নি ক্রয় করারও শামীল।

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, হৃদয়ের জন্য বাদ্যযন্ত্র দেহের জন্য মদের সমতুল্য। মদ দেহের উপরে যে কুপ্রভাব বিস্তার করে, বাদ্যযন্ত্রের সূরলহরী হৃদয়ের উপরে তার চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সুরে তালে মাতাল হয়ে সে শিরক করে, যেনা করে এমনকি মানুষ খুন করে *(মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৪)*।

তবে আন্তর্জাতিক খবরাখবর, দেশ-বিদেশের অনেক কিছুই স্যাটেলাইট চ্যানেলের বদৌলতে আমরা অবলোকন করে থাকি। কিন্তু এর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়াবলীর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর দিকগুলি হতে অধিকতর নিম্ন পর্যায়ের।

ভাল হোক মন্দ হোক স্যাটেলাইট চ্যানেল এখন আমাদের বেডরুম পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। এই চ্যানেলের কুপ্রভাব যেন আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের সোনামণি ও যুবসমাজকে স্পর্শ করতে না পারে। তারা যেন সুস্থ পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে সেজন্য পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত স্যাটেলাইট চ্যানেল বন্ধের জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

পরিশেষে আমরা সর্ব প্রকার অশ্লীল কথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকি। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কথা ও কর্মকে হারাম করেছেন' *(আরাফ ৩৩)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দেখা হচ্ছে চোখের যেনা, ফুসলানো কণ্ঠের যেনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কর্ণের যেনা, হাত দ্বারা স্পর্শ করা হাতের যেনা, অবৈধ উদ্দেশ্যে চলা পায়ের যেনা *(মাসিক আত-তাহরীক, জুন ২০০০ইং, পৃ. ৫২ প্রশ্নোত্তর: ১৩/২৫৩)*। আল্লাহ আমাদের অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

ভ্যালেন্টাইনস ডে ঃ একটি পর্যালোচনা

-মেসবাহুল ইসলাম*

সভ্যতা-সংস্কৃতি জাতির দর্পন। এর ঐতিহ্য ধরে রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু এর নামে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়া জাতির জন্য সুখকর নয়। কারণ বিভিন্ন দিবস পালন করার নামে তরুণ-তরুণীরা নিজেদের যৌবনকে প্রতিনিয়ত যেভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা নিশ্চিতভাবেই সংস্কৃতি চর্চার নামে অপসংস্কৃতি চর্চার নামান্তর। যেমন বিভিন্ন দিবস পালন। আর এর মধ্যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন ডে বা ভালোবাসা দিবস অন্যতম। বক্ষমাণ প্রবন্ধে ভালোবাসা দিবস সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

ভ্যালেন্টাইন ডে এর নামকরণঃ ভ্যালেন্টাইনস শব্দটি ইংরেজী এর শাব্দিক অর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী সেন্ট ভ্যালেন্টাইন দিবসে প্রেমিক বা প্রেমিকার কাছে প্রেরিত চিঠি, কার্ড ইত্যাদি। সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস নামক এক রোমান ধর্মযাজকের নামানুসারে ১৪ই ফেব্রুয়ারীর নামকরণ করা হয়েছে ভ্যালেন্টাইন ডে। Oxford ডিকশনারীতে বলা হয়েছে (Valenttine card) ভালবাসা দিবসের কার্ড। A card that you send to sb that you love on st valent-tines Day (14 February), often without puting your name on it. এমন একটি কার্ড যা ভ্যালেন্টাইন দিবসে তুমি কারো নিকটে পাঠাও, যাকে তুমি ভালবাস, যেই কার্ডের উপর তোমার নাম থাকবে না। A Person that you send a valentine to. এমন একজন ব্যক্তি যাকে তুমি ভ্যালেন্টাইনস প্রেরণ কর।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভালবাসা দিবস হিসাবে কখন থেকে চালু হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে কেউ বলেন, ৪৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে ভ্যালেন্টাইন ডে পালিত হয়ে আসছে। এছাড়াও এ সম্পর্কে কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে। ভ্যালেন্টাইন নামে রোমানের একজন লোক ছিলেন, যিনি পেশায় পাদ্রী ও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি রোমানদের মাঝে যীশুখৃষ্টের বাণী প্রচার করছিলেন। আর সেখানে তখনও খৃষ্টধর্মের বাণী পৌঁছেনি। ফলে খৃষ্টধর্ম প্রচারের অভিযোগে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের নির্দেশে তাকে ২৭০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যদণ্ড দেয়া। কারাগারে বন্দী থাকার সময় তিনি কারারক্ষীর এক অন্ধ মেয়ের চিকিৎসা করে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনেন। যার কারণে উক্ত মেয়ের সঙ্গে তার রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়। মেয়েটি তার মৃত্যুর কথা জেনেও তাকে প্রচণ্ড ভালবেসে ফেলে। আর মৃত্যুর দিন তিনি মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখে যান। যাতে লেখা ছিল Love from your val-en-tine। এ কাহিনী অনুযায়ী সেদিন থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা জুটিদের মধ্যে এ রীতি চালু হয়। তবে এর উৎসের পিছনে আরো তিনটি বিষয় দেখতে পাই ওয়া। ১. ১৪ই ফেব্রুয়ারী হ'ল রোমকদের বিবাহ দেবী 'ইউনু'-এর বিবাহের পবিত্র দিন। ২. ১৫ই ফেব্রুয়ারী হ'ল রোমকদের 'লেসিয়াস' দেবীর পবিত্র দিন। এদিন তিনি দু'টি শিশুকে দুধ পান করেছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল। ৩. রোম সম্রাট ক্লডিয়াস তার সেনাবাহিনীদের বিবাহ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করলে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামে তার এক সেনাবাহিনী তা অস্বীকার করে ও গোপনে বিবাহ করে ফলে সম্রাট জানতে পেরে ২৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে তার মৃতুদণ্ড কার্যকর করেন। আর সেই থেকে ভ্যালেন্টাইনের নামে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে অত্যন্ত জাকজমকের সাথে ভালবাসা দিবস পালিত হতে থাকে।

বাংলাদেশে এ সংস্কৃতি বেশী দিন আগে চালু হয়নি। যতটুকু জানা যায় যে, ১৯৯৩ সালে জনৈক প্রবীণ সাংবাদিক তার নিজস্ব পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় এ দিবস সম্পর্কে যুবক-যুবতির মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম প্রচার করেন।। এর মাধ্যমেই এ দিবসের আওয়াজ উচ্চারিত হয়। সর্বোপরি বলা যায় যে, প্রযুক্তির এ যুগে স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমেই বিশ্বের বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্টের সাথে তাল মিলিয়ে এদেশেও এখন এ দিবসটি তরুণ-তরুণীদের মাঝে অত্যন্ত ধুম-ধামের সাথে পালিত হচ্ছে।

ভালবাসা দিবসে যা হয়ঃ এদিনটিকে তরুণ-তরুণীরা আনন্দ উপভোগ করার অন্যতম দিন হিসাবে মনে করে। তাই তারা এ দিনে তাদের প্রিয় সঙ্গীকে তাদের মনের আকুতি জানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময় করে থাকে এবং পিতা-মাতা, ভাই-বোনকে তথা পরিবারের লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে দূরের কোথাও

---

* বি.এ (অনার্স), ৩য় বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পার্ক, চিড়িয়াখানা, রেস্টুরেন্ট কিংবা কোন মনোরোম বাগানের নিরালায় বসে তাদের প্রিয়জনকে নিয়ে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। হলমার্ক কার্ড কোম্পানীর সংখ্যা তত্ত্বের হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছর এ দিনটির ঠিক ছয় দিন আগ পর্যন্ত গড়ে ৯২ মিলিয়ন হলমার্ক কার্ড বিক্রি হয়। আর কত যে ফুল কেনা- বেচা হয় তার তো কোন হিসাবই নেই। শুধু ব্রিটেনেই ২০০১ সালের হিসাব অনুপাতে ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে ৬০,০০০০০ (ষাট) লক্ষ গোলাপ ও দুই কোটি বিশ লাখ কার্ড বিক্রি হয়। অনুরূপভাবে আমেরিকাতেও দেখা গেছে যে, আমেরিকার চার জনের মধ্যে তিনজনেই এ দিবস পালন করে থাকে। এ দিনে তারা ভালবাসা বিনিময়ের জন্য তের কোটি গোলাপ ও একশ' কোটি ডলারের চকলেট ব্যাবহার করে থাকে।

বৃটিশ ও ইতালিয়ান তরুণীদের বিশ্বাস, ১৪ই ফেব্রুয়ারী সূর্যোদয়ের আগে তারা প্রথম যে পুরুষকে দেখবে তার সঙ্গে আগামী ১ বছরের মধ্যে তার বিয়ে হবে। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার উলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খৃঃ) তার বিখ্যাত হ্যামলেট নাটকে এ বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি করেন ওফেলিয়ার (Ophelia) মুখ দিয়ে গাওয়ানো একটি গানে এভাবে- Tomorrow is St. Valentine`s Day, all in the morning betime, and I a miad at your widow, To be your Valentine. আগামীকাল সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে। সমস্ত সকাল জুড়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আছি তোমার 'ভ্যালেন্টাইন' হ'তে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ভালবাসা দিবসঃ

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে দিবস পূজার স্থান নেই। কারণ যদি দিবস পালন করতেই হত তাহলে রাসূল নিজেই নবুওয়ত দিবস, হিজরত দিবস এবং ইসলামের সর্বপ্রথম সামরিক যুদ্ধের জয় তথা বদর যুদ্ধের বিজয় দিবস পালন করতেন। তা ইসলামের দৃষ্টিতে ভালবাসা দিবস সহ যেকোন দিবস পালন নিষিদ্ধ। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন বিষয় সৃষ্টি করল যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত' (*বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪০*)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, 'প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামী' (*ছহীহ নাসাঈ, হা/১৫৬০*)।

অন্যদিকে এই দিবসটি খৃষ্টানদের থেকে আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। আরো স্পষ্ট যে নামকরণ করা হয়েছে একজন খৃষ্টান ধর্ম যাজকের নামে। সুতরাং কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি তা পালন করে তাহলে সে খৃষ্টানী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে সে তাদের মধ্যেই অন্তভুক্ত হবে (*মায়েদা-৫১১*)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির অনুসরন কিংবা অনুকরণ করল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হল' (*আবুদাউদ, আহমাদ, সনদ হাসান, মিশকাত, হা/৪৩৪৭*)।

একজন নারী যাদের সঙ্গে চলতে পারেঃ ইসলামে ছেলে-মেয়ে অবাধ চলাফেরা হারাম করা হয়েছে। যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ তাদের সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়া, ভাব বিনিময় করা, চলাফেরা আদান প্রদান সিদ্ধ নয়। একজন নারী কাদের সঙ্গে চলতে পারে এমর্মে আল্লাহ বলেন, 'হে নবী (ছাঃ)! ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনা মুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারনা না করে' (*নূর-৩১*)।

হাদীছে এসেছে যে যখন এক যুবতী অন্য অপরিচিত যুবকের সাথে মিলিত হয়, তখন সেখানে তৃতীয় জন শয়তান মিলিত হয় (*তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/৩১১৮*)। উক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা কাদের সঙ্গে চলতে পারে। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে শয়তান তাদের মাঝে শামীল হয়ে তাদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন, 'শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' (*বাকারাহ -২০৮*)।

উপসংহারঃ পরিশেষে বলা যায় ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রবর্তিত রীতি অনুকরণ করতে গিয়ে অবৈধভাবে যে অর্থ, সময়, মেধা, ব্যয় হয় তা আমরা অসহায় দরিদ্রদের মুখে হাসি ফুটাতে বৈধভাবে ব্যয় করি না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না' (*বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭২৮*)।

বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা

*-গোলাম কিবরিয়া**

ইসলাম মানবজাতিকে কল্যাণকর পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। অহি-র বিধানের পথ অনুসরণ করতে পারলে নিশ্চিত হয় শান্তিপূর্ণ নিরাপদ জীবন। এজন্য জ্ঞান অর্জন করা মানুষের জন্য আবশ্যক। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ইসলাম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। তাই বিজ্ঞজনেরা অশিক্ষিত মানুষকে অন্ধের সাথে তুলনা করেছেন। যারা স্বাভাবিক জ্ঞানকে শিক্ষার্জনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করে প্রতিটি বিষয়ের তাৎপর্য বোঝার এবং নিজের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টায় লিপ্ত, তারা কখনোই অজ্ঞতায় নিমজ্জিতদের সমান হতে পারে না। পৃথিবীতে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নিরূপণে জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অনুসৃত প্রধান ঐশী ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভিক বাণীতেই পড়ার প্রতি তাকিদ দিয়ে বলেন, 'পড়! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হ'তে। আর তোমার প্রতিপালক। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না' (*সূরা আ'লাক্ব ঃ ১-৫*)।

মানুষের যাবতীয় শিক্ষার মূল উৎস স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সৃষ্টি জগৎ ও সৌরজগতের সবকিছুর বিবরণ বই পুস্তকেই লিপিবদ্ধ। এ বই হলো বিশ্বমানবের জন্য একটি মানচিত্র সদৃশ। বই পড়ে সৃষ্টি জগতের সব রহস্য এবং আল্লাহর অস্তিত্ব ও নিদর্শনাবলীর যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর সব জ্ঞানের ভাণ্ডার হল বই। এতে রয়েছে মানব জাতির ইতিকথা ও জ্ঞানের পথ নির্দেশিত। বই মানব জীবনের এক পরম হিতৈষী বন্ধু এবং জীবন সঙ্গী। ইহা ধর্মভীরু মানুষকে সৎপথ দেখায়। জীবনকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়।

আধুনিক বিশ্বের উন্নতিসাধনে জগতের সবকিছু প্রচার-প্রসারের এবং মানুষের মরণব্যাধি প্রতিরোধে, জীবন দানের ব্যাপারে ঔষুধ পত্রাদি আবিস্কারের বাহন হচ্ছে মহামূল্যবান বই। দুনিয়ায় যারা মরেও অমর হয়ে আছেন, সে সব মহামানব, ধর্মীয় নেতা, জ্ঞানী-গুণীজন, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বৈজ্ঞানিক সবাইকে এ বইয়ের মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা মানুষকে মহৎপ্রাণ করে তোলে, চিত্তকে মুক্তিদেয় এবং মানবাত্মাকে জীবনবোধে বিকশিত করে। বিভিন্ন বিষয়ে সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জন এবং পরিপূর্ণ মানসিক প্রশান্তিলাভ করতে হলে অবশ্যই বই পড়া প্রয়োজন। আবার প্রকৃত জ্ঞানের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যও বই পড়া একান্ত প্রয়োজন। একজন পাঠক নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী বই নির্বাচন করে অগাধ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন। একদিকে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। অপরদিকে বিদ্যার্জনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল-কুরআনের শিক্ষার আলোকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) জ্ঞানার্জনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয' (*ইবনু মাজাহ সনদ হাসান,মিশকাত হা/২১৮*)।

জ্ঞানের বদৌলতে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসাবে মানুষকে শুধু সুস্থ-সবল শরীর ধারণ করলেই চলে না। দেহের সঙ্গে মানব মনের বিকাশ প্রয়োজন। দেহ রক্ষা করা যেমন অবশ্যকর্তব্য, তেমনি

মানুষের আত্মাকেও বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যকীয়। মনকে সজাগ-সবল রাখতে না পারলে মুসলমান জাতি যথার্থ প্রাণ, শক্তি লাভ করতে পারবে না। তাই প্রকৃত বিদ্যার্জনের জন্য মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা তথা রুচিশীল সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করতে হবে। অনুকূল পরিবেশে ব্যাপকভাবে বই পড়ে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ খুব সহজেই তার মনোরাজ্যের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে। সৃষ্টিজগতে মানব জাতিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদানের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, 'হে নবী আপনি বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান'? (*যুমার-৯*)।

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম দর্শন, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-আকাঙ্খা এবং অন্তরের সত্য স্বপ্ন সবকিছুর সমন্বয়েই বিভিন্ন সাহিত্যের জন্ম। বই পড়া ছাড়া শিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চার অন্য কোন উপায় নেই। বই পড়ার আনন্দ মানুষের মনে পুষ্টি যোগয়, তার ভেতরের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। মানুষের জন্য অকল্যাণকর বিষয় বর্জনের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বারংবার তাকীদ দেয়া হয়েছে।

---

* বি.এ (অনার্স), ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সেই শিক্ষা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক, যা তাদের প্রকৃত সত্যের আলো দেখায়, সরল সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং মানবতার কল্যাণ সাধন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য চর্চা শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। যে জাতি মনের দিক দিয়ে বড় নয়, সেই জাতি জ্ঞানেও বড় নয়। রুচীশীল সাহিত্য চর্চা ছাড়া কোন জাতির সুস্থ মানসিকতা ও কল্যাণকর মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না। তাই আদর্শ শিক্ষক সমাজ ছাত্রদের মনে জ্ঞানের কৌতূহল সৃষ্টি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞাকে সদা জাগ্রত রাখতে পারেন, তার আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান পিপাসায় নিবৃত্ত করতে পারেন। একে নিবৃত্ত করতে হলে পাঠ্যাভাসের বিকল্প নেই। মানুষের মনে আনন্দ সঞ্চার করার জন্য সুশীল সাহিত্যের অনুশীলন প্রয়োজন। খুশি ও আনন্দে মানুষের আত্মা সতেজ হয়, জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। আসমানি কিতাব বা ঔশীগ্রন্থের মাধ্যমে যেভাবে মানব জাতি আল্লাহর পরিচয় ও দিক নির্দেশনা পায়, সেভাবে মানুষ পার্থিব বইয়েও জাগতিক বিভিন্ন বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

একটি আলোকিত সুন্দর সমাজ গঠনের লক্ষে জনগণের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানোর আন্দোলন গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়।

তাই আসুন! আমরা প্রাত্যাহিক জীবনে অযথা খরচ বা অহেতুক অর্থ অপচয় বর্জন করে নিজেদের পছন্দমত বই-পুস্তক ক্রয় করি। দেশের নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-যুবক, শিশু-কিশোরদের বই কেনা ও সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করি, যাতে সব বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বই পড়ার মানসিকতা তৈরী হয়।

ইংরেজী শেখার গুরুত্ব

-মোস্তাক আহমেদ পলাশ *

বিভিন্ন পরিসংখ্যান হতে জানা যায় যে এই পৃথিবীর ৩৫০ মিলিয়ন লোক ইংরেজীকে প্রথম ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করে। ৩০০ মিলিয়ন লোক ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে। ৬০টিরও বেশী দেশে এটি অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী কম্পিউটারের তথ্যে ইংরেজী ব্যবহার করা হয়। উপরোল্লেখিত তথ্য বিবরণী হতে জানা যায়, বর্তমানে এই বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজী না জানার বিকল্প নেই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে প্রতিবছর আমাদের দেশে ইংরেজী না জানার কারণে কয়েক লক্ষ লোক চাকুরীর বাজারে টিকতে পারছে না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চ ডিগ্রী নিয়েও ইংরেজীতে আমাদের অবস্থা শোচনীয়। শুধু বিদেশে চাকুরী নয় নিজ দেশের প্রয়োজনে আমাদের ইংরেজী জানতে হবে। কারণ উচ্চশিক্ষার অধিকাংশ বই ইংরেজী ভাষায় রচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনক হলেও সত্য যে, ইংরেজী ভীতি আমাদের মাঝে প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিগত সালের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে অধিকাংশ বোর্ডে গড়ে ৬০% -এরও অধিক শিক্ষার্থী ইংরেজীতে ফেল করেছে। শুধু ইংরেজীতে পাশের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় কুমিল্লা বোর্ডের ২০০৯ সালের এস এস সি পরীক্ষায় পাশের হার ২০০৮ সালের চেয়ে ২৬% বেড়ে গেছে। ২০০৮ সালে কুমিল্লা বোর্ডের এস এস সিতে পাশের হার ছিল ৪৬% যা ২০০৯ সালে ৭৩% উন্নীত হয়। যা হোক বর্তমানের এই দুরাবস্থা আমাদেরকে অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের শিক্ষার্থীদের ছোট থেকেই ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা শিক্ষায় একই রকমের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বুঝতে হবে এটি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা শুধু পরীক্ষায় পাশ করার কোর্স নয় । তৃতীয়তঃ দেশের প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ব্যবহারিক ইংরেজী মাত্র কোন শিক্ষার্থী শুধু পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করলেই চলবে না। তারা ইংরেজীতে কতটুকু দক্ষতা অর্জন করেছে, এজন্য স্পিকিং টেষ্ট নিতে হবে। গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ অব্যশই জানতে হবে। কিন্তু ব্যাকরণ না হলে ইংরেজীতে কথা বলা যায় না এই মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। কারণ আমারা যখন মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলি তখন কিন্তু ব্যাকরণ মেনে চলিনা। কিন্তু মোটামুটি শুদ্ধ ভাবে কথা বলার জন্য যে কোন ভাষায় ব্যাকরণ জানতে হবে। পরিশেষে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগে কমপক্ষে একটি বাধ্যতামূলক ইংরেজী কোর্স থাকবে। যা হোক মনে রাখাতে হবে, এটি একটি ভাষা। যে কোন ভাষার দক্ষতা অর্জনে প্রথমে সেই ভাষার শব্দভাণ্ডার জানতে হবে। তারপর সেই ভাষায় পড়তে, লিখতে, শুনতে এবং বলতে এই চার প্রকারের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তবেই একটি ভাষা পূর্ণাঙ্গরূপে আয়ত্ব করা সম্ভব।

---

* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

An Extra-ordinary Youth Association

-Hasibul Islam *

Bangladesh a south-east Asian Muslim country which is densely populated by its 1.60 billion people. In accordance with its high population rate there is a wide range of organizations in this country followed by various goals and purposes from different aspects such as religion, theory, economics, environment and so on. But it is an affair of grief that most of these organizations are doing very little to note for their nation or country, let alone serving their main purpose. Rather, almost all of them hanker after their own political and economic interests. They, every now and then, try to obtain upper hand and unjust dominance at any cost over the people they take as their opponents.

Even if we look around the student organizations of our country, we get the same feature as we see that how they are getting involved into these kinds of mischief, how they make their foremost duty to take control over educational institutions. They strive consuming their valued golden moments of student life to occupy the residential halls of the educational institutions and to have political and economical benefits. They have little point to spend time in their main sphere of study, let alone thinking over the national development and progress. As a result, panic and unrest prevail in the educational institutions always, particularly in Public universities, the highest venue of Education. In the long run, the progress of study is being badly hampered in the university campuses of the country. The unrestrained, selfish, wanton and blood- thirsty student organizations are greatly responsible for this and main obstacle to reinforce the cherished atmosphere of study and research and overall development in the field of higher knowledge.

In this grave situation, like the full moon in dark night there have also some organizations come forth with their exceptional and extra-ordinary characteristics. Yes, I am saying here about that organization, named "Bagladesh Ahlehadeeth Juboshangho" which is known as `Bangladesh Ahlehadees Youth Association' in English.

Alhamdulillah, this is the only one student as well as youth organization in Bangladesh which designs its all activities keeping pace with the last revelation of Allah (SWT) i.e. The Holy Quran and the Saheeh Sunnah. It is the only youth organization here which follows strictly the main sources of Islam on the basis of understanding of Salafe Saleheen i.e. pious predecessors of the Muslim Ummah. Since the common people of Bangladesh sunk through ages in the realm of Jahiliyah, as they had very little scope to come across the main sources of Islam due to the ignorance as well as the lack of qualified Islamic teachers; True knowledge of Islam was never available here. So that the people of Bangladesh are now in tremendous need of pure knowledge of Islam in every step of life that may lead them towards building a nation, best in every field of human development from spiritual, intellectual and worldly aspects, in true sense. 'Bangladesh Ahlehadeeth Youth Association' is just dealing with these magnificent deeds to guide the new generation of this country to the path of Deen as it is revealed.

Now I want to give here an account of the activities of this distinguished and extra-ordinary organization at a glance. First of all, it should be noted that Ahlehadeeth is the name of a way or path. It is not the name of any religious school (Majhab) or a paticular sect or ism. However, it is the name of the path of the last revelation (Ohi) sent by

---

* 2nd year, Department of English, University of Rajshahi.

Almighty Allah (SWT) to our last and the greatest prophet Muhammad (SM), the way of the holy Quran and Saheeh Hadeeth. The honorable followers (pious predecessors) of our greatest prophet (SM) used to call the people to this way. The full guidance of man both of his religious and earthly life is available here. This Youth Association calls the young people only to this heavenly and sacred path. The last destination of this path is nothing but the eternal Jannah.

The purpose of this organization is to achieve the satisfaction of the Almighty Allah (SWT) by propagating and inculcating pure Tawheed in all spheres of life by following exact instuctions of the holy Quran and saheeh sunnah. The social and political objectives of this movement are to bring about all-round reforms of the society through the reformation of beliefs (Aqeedah) and deeds.

The organization has five basic principles. that are in short- First: the members of this association give utmost priority of the commands and prohibitions of the holy Quran and saheeh Hadeeth unconditionally and without any hesitation. Second: they perform all their duties according to the rules of the last revelation. They do not accept any word which is related to the Islam without clear and evident document from the holy Quran and Saheeh Hadeeth. So that, they do not allow following any one's opinion blindly in the matter's of Shariah without proper document. In the same way, they strictly oppose following different isms in the name of earthly matters like Capitalism, Socialism, Democracy, Nationalism, Secularism etc. that has crept into the society. Third: they strive heart and soul to find out the answers to the age-questions from the last revelation. Four: they consider and strictly believe that Islam is the only solution to all religious and earthly problems. Fifth: they attempt hard to establish the muslim unity on the basis of unconditional acceptance of the orders and prohibitions of the holy Quran and Saheeh Hadeeth.

Through implementation of the aforesaid aims, objectives and principles, Bangladesh Ahlehadeeth Youth Association wants to establish such an Islamic society, where there shall be no heterogeneous isms in the name of progressiveness, nor any Majhabee (sectarian) parochialism in the name of Islam.

They want to implement their aims and objectives by adopting four type programs namely- (1) Propagation (Tableegh), (2) Organization (Tanzeem), (3) Training (Tarbiyat) and (4) Social reforms (Tajdeed-e-Millat). For this purpose workers of this organization are divided into four categories. They are (1) Supporter, (2) Primary member, (3) Worker and (4) member of central council. The stages of the organization are also classified into four categories. They are (1) branch, (2) Area, (3) district and (4) Centre.

In the conclusion we can say that, Bangladesh Ahlehadeeth Youth Association is an exceptional and extra-ordinary organization in our country. No other organization here is as transparent and pure as it is. This organization does never seek self interest and earthly profit as their peer organizations. While Most of the youth associations invite the young people to earthly-temporary achievement, fruitfulness and success, Bangladesh Ahlehadees Youth Association as the only organization invites people to eternal happiness, peace and success that could never be gained at any cost in this world. So the people who have longing for permanent happiness, comfort and true pleasure should come forward to join this organization and lead the rest of the life in accordance with the principles of the last revelation. May Allah grant us tawfeeq to be amongst the righteous people and unite us all in Jannah in our life hereafter..ameen.

Student politics and its reality

-Mukhtarul Islam[*]

Student politics is a very common issue in our country from long ago. Students are the vital force of a nation. The future of a country greatly depends upon the students. But while education is the backbone of a nation, student politics is about to break this bone now a days. We will try here to find out some features about student politics and its various aspects.

student politics means the politics where the students take part. In the past student politics was glorious. Then students who used to participate in politics were aware of their duties. They were attentive to studies. They did not neglect their primary duty to acquire knowledge by studing hard. But they were always ready to take part in any political activities like protesting any illegal decision or activity.

In the past student politics of great leaders like sher-E-Bangla Fazlul Haque, Mawlana Akram Khan etc were golden. It is known to us that Akram Khan established Bangla language in madrasha ground as a pioneer at first. They took part in politics for the greater interest of the students as well as of the whole nation. They were far away from the black claws of narrow party politics.

In the past students took part in politics to uphold the rightful demands of students. If any right of students was violated, they would protest. Then there was no division in student politics as they were not involved with party politics.

In course of time, at present, the picture of student politics has been changed. It has tarnished the golden image of the past. Now what is going on in the name of student politics is not student politics at all. It is now the worst figure of so-called politics.

Now student politics has become related with party politics. There are many causes for why students take the unfair way like terrorism, violence in campus by joining politics. Most of the people of our country are poor. They can't spend much money for study. Except that, many of our educated youngs are unemployee. They feel always down in disappointment. They think that if they wouldn't get a better job after completion of any degree why they should study properly? In addition to this, when he sees that others are getting good jobs just being backed by party politics supports, they think then that it is the better way to succeed in life. By this way party politics is spreading in campus.

It is often seen that many gurdian complete their duty to thier children just by paying due costs. But they don't care properly whether they are studing or not. They don't try to know whether he is learning accordingly or swindling by the name of study.

Political leaders also try to influence the teachers in unjust manner. We have seen that if a teacher did not give them illegal opportunities they attacked them.

---

* 4th year, Department of Arabic, University of Rajshahi.

As a result student politics is no more related with the interests of the students as well as the nation. Rather now student politics has become the puppet of party politics and the campus of educational institutions has become mini-cantonments full of mortal weapons and ammunations.

Since student politics cannot get rid of the claws of party politics, division has become inevitable among the students, it induces the students of a particular political party to be aggressive towards the students of other political parties. So violence is now very common part of an educational campus. Sometimes to avoid clashes between rival student groups, educational institutions become closed day after day. Because of such kind of nasty student politics, normal atmosphere of education has become begger's description. As a result, student politics gives rise to session jam in public universities.

Now another name of student politics is terrorism, snatching away tenders, toll collection and such kinds of nasty activities which never confirm to the norms of real student politics at all. At present those who take part in student politics don't study regularly. They run after power and money. They don't bother about their main duties. In this way, student politics has beome a curse for our country.

Students are the future leaders of the country. So they are supposed to have knowledge about the national politics and its problems. But since now student politics is far away from its real norms, it becomes a matter of concern for all. Many masterminds have raised question whether student politics should exist or not. Many have suggested that either student politics should be changed in it's formation or it should be stopped.

Student politics is now a burning issue. The dignified place of higher education has been a volcano of terorrism and violence just because of this politics. Without acquiring knowledge students are getting involved with terorist activities. So that, It is high time to take proper steps to reform it, and if necessary, to introduce representation system among students on the basis of age, efficiency and merit. Or else, if we fail to control over this monster, our independence as well as our peaceful sustainance will be doomed.

AHL-I-HADITH: The followers of the prophetic traditions, who profess to hold the same view as the early Ashab-al-hadith or Ahl-al hadith (as opposed to Ahl-al-ray). They do not hold themselves bound by `Taklid'...but consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practices from the authentic traditions which together with the Quran are in their view the only worthy guide for the true muslims.

স্মৃতিচারণ

*-শামসুল আলম**

ভূমিকা : যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তাক্ত লাশের গন্ধ, দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে হত্যা-সন্ত্রাস আর নৈরাজ্যকর অবস্থা বিদ্যমান, ছাত্র রাজনীতির হিংস্র ছোবলে দেশের পরিস্থিতি যখন ভয়াবহ ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৮-২০০৯ সেশন)-এর একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার সাহসী পদক্ষেপ নব বসন্তের প্রাক্কালে যেন এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এ উপলক্ষে সুদূর অতীতের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সেশনের সভাপতিগণের কাছে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ও স্মৃতিবিজড়িত ঘটনা সম্বলিত লেখা আহ্বান করা। তাই আমার সাংগঠনিক জীবনের কিছু ছিটেফোঁটা স্মৃতি ও দু'একটি স্মরণীয় ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি : যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৮-৮৯ সেশনে আইন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পদচারণা শুরু হয়। ভর্তি হই ১০ই আগস্ট ১৯৮৯ সালে। পিতা-মাতার আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা এবং নিজের জীবনের অসীম স্বপ্ন ছিল যে, হয়ত আমি একদিন জজ-ব্যারিস্টার অথবা একজন ডাকাবুকা উকিল হব। হাযারও আশা-ভরসা আর স্বপ্নকে সামনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড় ভাই কবীর আহমাদের (চৌগাছা, যশোর) নিকট মাদারবখ্শ হলে (রুম নং ৩০৭) কিছুদিনের জন্য অবস্থান করি। এই বড় ভাইয়ের পরামর্শ ছিল দেখ আলম, এই বিশ্ববিদ্যালয় যেমন একটি ভাল নামী-দামী স্থান তেমনি খারাপ স্থানও বটে। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, 'তুমি এখন বুঝবে না'। তবে আমার কথা অনুযায়ী চল। প্রথম কথা তুমি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত হবে না, বন্ধু-বান্ধবের সাথে অযথা বেশী সময় কাটাবে না। তবে পড়ার ফাঁকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অরাজনৈতিক সেবামূলক সংগঠনের সাথে যুক্ত হ'তে পার, সাংবাদিকতাও করতে পার ইত্যাদি। তিনি তার পরিচিত অপর এক বড় ভাই কবীরের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনিও আইনে পড়তেন (বাগআঁচড়া, যশোর)। তার মাধ্যমেই আমার সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি হয়। এছাড়া পাঠক ফোরাম, বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতিতে অবসর সময় কাটাতাম।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে দেখতে থাকলাম রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড, মিছিল, সমাবেশ, বিক্ষোভ, মারামারি, হানাহানি, হরতাল, ধর্মঘট আর কত ছাত্রের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব বরণের করুণ দৃশ্য। ক্যাডারদের অস্ত্রের মহড়া, ডাইনিং রুমে দলীয় নেতাদের ফ্রি খাওয়ার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সবই চোখের সামনে অহরহ ঘটত। যা মনে খুব পীড়া দিত। মনে হ'ত এই কি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ শিক্ষিত ছাত্রদের কর্মকাণ্ড! একদিকে ছাত্র রাজনীতির নামে স্বার্থবাদের অক্ষুণ্ণতা রক্ষা অন্যদিকে সম্মানিত শিক্ষকদের মাঝে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের জয়জয়কার আমাকে স্তম্ভিত করত। এভাবে আমরা ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে পেয়েছি এক অশান্ত আর নৈরাজ্যকর পরিবেশের মধ্যে।

সে সময় একটি ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সাথে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। ১৯৯২ সালে ঘটনা। জোহা হল দখলকে কেন্দ্র করে সেই সংগঠনটির সাথে বাকি সবগুলো দলের এক ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে ব্যবহৃত হয় রামদা, বন্দুক, বোমা আরও কত কি! উভয় পক্ষ মিলে খুন হয় ৫/৬ জন। আমি তখন মাদারবখশ হলের আবাসিক ছাত্র। সেদিন হল ভ্যাকান্ট হয়। শফিক ভাই

---

* সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(সাতক্ষীরা) সেদিন আমার সাথে ছিল। হলের ডাইনিং কর্মচারী আব্দুল খালেকের বাড়ীতে (মেহেরচণ্ডী) আশ্রয় নিই। ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী যেতে কতইনা দুর্ভোগ! সে সময় এরকম কত বীভৎস রাত, কত ভয়ংকর দিন ক্যাম্পাসে অতিবাহিত হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়ে এখানে শেষ করা যাবে না।

কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসন্ধান : আমি জীবনে কখনো কোন দলে প্রবেশ করিনি। কেননা বিভক্তির কোন রূপকে আমি মন থেকে গ্রহণ করতে পারতাম না। একই কারণে ইসলামের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকলেও মুসলমানদের মধ্যে শতধাবিভক্তি আমাকে সব সময় হতাশাগ্রস্ত করত। সব সময় মনের মাঝে ঘুরপাক খেত কী উপায়ে মুসলিম সমাজকে একতাবদ্ধ করা সম্ভব। ১৯৯০ সালের কথা। শফিক ভাই আর আমি স্টেশনের পার্শ্বে স্মৃতি ছাত্রাবাসে থাকতাম। একদিন হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন, দেখ আলম, আমরা যেভাবে ছালাত আদায় করি তা কিন্তু সঠিক হয় না। আমি বললাম, কেন? তিনি তার নিয়ম-কানূন অনুযায়ী ছালাত আদায় করে দেখিয়ে বললেন, এই দেখ, এভাবে পড়তে হয়। আমি বললাম, আপনি এ আবার কোথা থেকে আমদানী করেছেন? আপনি শী'আ নতুবা ক্বাদিয়ানী হয়ে গেছেন? তিনি বললেন, দেখ এটাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের পদ্ধতি। আমি বললাম, এটাই যদি সঠিক হয় তাহ'লে এদেশের কারোই কি নামায হচ্ছে না, সবাই কি বেঠিক আর জাহান্নামী? আরও কত প্রশ্ন। যাহোক তিনি আমাকে কিছু বই-পত্র দিলেন। পরে একদিন রাণীবাজার মাদরাসা মার্কেটের ৩য় তলার একটি অফিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখি চেয়ারে বসা একজন ভদ্রলোক। শ্যামবর্ণের এই ভদ্রলেকটি আর কেউ নন; তিনিই হ'লেন শ্রদ্ধেয় স্যার ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি আমার নাম-পরিচয় নিলেন। আমিও কিছু প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে কিছু বই-পত্র দিলেন। রুমে নিয়ে সেগুলো পড়তে থাকলাম। ভাল লাগে আবার ভয়ও লাগে। হানাফী মুফতী-মাওলানার কাছে যাই। তারা আবার উল্টা বুঝিয়ে আমার মাথা খারাপ করে দেন। এমতাবস্থায় আমি বার বার আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে থাকি "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সরল-সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দাও"। অতঃপর একদিন কোন এক শুভক্ষণে চরম আকাংক্ষিত সেই সরল পথ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথের দিশা পেলাম। *ফালিল্লাহিল হামদ্*।

অপরিসীম মানসিক বল সঞ্চয় করে দীর্ঘদিনের আচরিত মাযহাবী আমল ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক আমল শুরু করলাম। সব কিছুই যেন নতুন মনে হ'তে থাকে। মনের ভিতর চলে আসে বড় ধরনের এক পরিবর্তন। খুঁজতে থাকি নতুন এ সুন্দর পথের লোকগুলো কোথায় থাকে? তারা কারা, কেমন আছে, অনুসন্ধান শুরু হল। শফিক ভাই একদিন আমাকে জোহা হলের ১১৬ নং কক্ষে একটি বৈঠকে নিয়ে যান। সেখানে ছিলেন শেখ রফিক (সাতক্ষীরা), সিরাজুল ইসলাম (যশোর), গোলাম মোস্তফা (মেহেরপুর) আরও অনেক ভাই। এরপর আমি মাদারবখ্শ হলে আবাসিক ছাত্র হিসাবে উঠে দেখলাম সেখানে বেশ কিছু আহলেহাদীছ ছাত্র আছে। আমি তাদের সাথে একত্রে বৈঠকে বসার প্রস্তাব করি। তারা সানন্দে সাড়া দিল। তখন এ হলে ছিল হেলাল (দিনাজপুর), মন্জু (দিনাজপুর), আব্দুল্লাহ (চারঘাট, রাজশাহী) সহ ১০/১৫ জন ছেলে। জোহা হলে ছিল শিমুল ও পলাশ (সাতক্ষীরা)। হবিবুর রহমান হলে ছিল আব্দুর রব (মেহেরপুর), সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), বর্তমানে যিনি মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক, রফিকুল ইসলাম, এ.এস.এম আযীযুল্লাহ, আব্দুল গফুর, ফারুক, আবু আহসান (লিপু), কামরুয্যামান (বকুল) (সাতক্ষীরা) এবং আরো ৮/১০ জন আহলেহাদীছ ভাই। এছাড়া অন্যান্য হল মিলে আমরা ৩৫/৪০ জন ছাত্র একত্রে বৈঠক করতাম। বেশীর ভাগ সময়ে মাদারবখ্শ হলে বসতাম। এ হলের ইমাম যয়নাল আবেদীন আমাদেরকে সহযোগিতা করতেন। এছাড়া কখনও শিমুলের জোহা হল, কখনও কেন্দ্রীয় জামে মসজিদেও প্রোগ্রাম করতাম। সকলের অনুরোধে নতুন হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে দা'ওয়াতের কাজ শুরু করি সর্বত্র। এ সময় **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর কেন্দ্র থেকে ফারুক (দুর্গাপুর,

রাজশাহী), আহসান হাবীব (গাইবান্ধা), মহিদুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)সহ অন্যান্য ভাইয়েরা নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা করতেন।

পথিমধ্যে জমঈয়ত ও যুবসংঘের মাঝে সম্পর্কের ফাটল আমাদের বেশ বিব্রত করে তুলে। এমনকি আমরা কয়েকজন সংগঠনভুক্ত না থেকে নিজেরা দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। কিন্তু অচিরেই কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ও শৃঙ্খলাবিহীন কাজের দুর্বলতা টের পেলাম। মানসিকভাবে আমরা অনেকটাই ভেঙ্গে পড়লাম। যাহোক পুনরায় আমরা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম । এক্ষেত্রে আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের একটি পত্রও আমাদের খুবই অনুপ্রেরণা যোগায়। ৭ অক্টোবর '৯২ তিনি সাংগঠনিক কাজে কেন্দ্রীয় অফিসে আসার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হন এবং রাজশাহী সদর হাসপাতালে ভর্তি হন আমি ও কয়েকজন সাথী ভাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং পরবর্তীতে তাঁর বাসায় উপস্থিত হয়ে শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিই। সুস্থ হওয়ার পর স্যারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জনের নিকট কৃতজ্ঞতাপত্র প্রেরণ করা হয়। আমি ও আমার সাথীদের উদ্দেশ্যে লেখা অনুরূপ একটি পত্র আমাদের হস্তগত হয়। উক্ত চিঠির তাক্বওয়াপূর্ণ অসাধারণ ভাষ্যভাব ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশ আমাদের মুগ্ধ করে। যাহোক আমরা 'যুবসংঘে'র দ্বীনী কাফেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে শরীক হ'লাম। ১৯৯২-৯৩ সেশনে রাবি যুবসংঘের সভাপতি হিসাবে আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হ'ল। হানাফী থেকে আহলেহাদীছ হওয়াতে সম্ভবত আল্লাহ আমার মনে দারুণ জাযবা সৃষ্টি করে দেন। *ফালিল্লাহিল হামদ*। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহলেহাদীছ শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারী লিস্ট করে প্রায় সকলের কাছে সংগঠনের দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি। দা'ওয়াত নিয়ে যেতাম দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে। ছুটিতে আমার নিজ গ্রামেও (ফুলসারা, চৌগাছা, যশোর) ব্যাপক দা'ওয়াত দেই। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় সকলেই এ দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। শুধু তাই নয় এলাকার আলেমদের সাথেও আমার অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়। ফলশ্রুতিতে আমার উপর নেমে আসে সামাজিক চাপ ও অমানুসিক নির্যাতন। কঠিন চাপ আসে নিজ পরিবার থেকেও। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার খরচও কিছুদিন তারা বন্ধ করে দেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার মেঝো ভাই ও ভাবীর (যিনি গত ১ ফেব্রুয়ারী'০৮ যশোর নিজ বাসায় সকালে আগুনে পুড়ে মারা যান। *ইন্নালিল্লাহ...*) সহযোগিতায় আমাকে তেমন কোন সমস্যা পড়তে হয়নি। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন। বর্তমানে আমার পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থা ভাল। কেউ কেউ আহলেহাদীছ হয়েছেন। অন্যরা অন্তত আমার দা'ওয়াতের পথ যে সঠিক তা স্বীকার করে নিয়েছেন। গ্রামের অনেক জ্ঞানী-গুণী, সমাজপতি এমনকি ঐ সকল মুফতীগণও তা মেনে নিয়েছেন। অনেকেই মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর পাঠক হয়েছেন *আল-হামদুলিল্লাহ*।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে গিয়ে কখনও কখনও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। আমি তখন মাদারবখ্শ হলের ৩৪০ নং কক্ষে থাকতাম। 'যুবসংঘে'র বই-পুস্তক, ক্যালেন্ডার বিতরণসহ ব্যাপক প্রচারণায় তখন হলগুলিতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পড়ে যায়। এ অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই কারো কারো চক্ষুশূল হয়ে দেখা দিল। একদিন সন্ধ্যায় নিজ কক্ষে প্রবেশ করতেই রুমমেট কাওছার ভাই (চুয়াডাঙ্গা) বলল, আলম তুমি এখনই হল থেকে বেরিয়ে যাও। নতুবা ওরা তোমাকে আজই মেরে ফেলবে। ওরা (একটি ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডার) আমাকে বলে গেছে, সে যেন আজ রাতের মধ্যে হল ছেড়ে চলে যায়, নইলে তার লাশ পড়ে যাবে। আমি শুনে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে কাওছার ভাই? তিনি বললেন, তোমার সংগঠন 'যুবসংঘ' নাকি অমুক ইসলামী সংগঠনের আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন হিসাবে কাজ করছে। তাছাড়া এ হলে তোমার কক্ষে ও মসজিদের প্রোগ্রামে তোমাদের এত ছেলের উপস্থিতি

ওদের দৃষ্টি কেড়েছে। তুমি ভাই এখনই চলে যাও, আমার শরীর কাঁপছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে বললাম, কাওছার ভাই ভয় পাবেন না। আমি কি করি এবং কেন তা করি তা আপনি ভাল করেই জানেন। তিনি বললেন, তোমাদের সংগঠন তাদের সমর্থক নয় তা আমি জানি। তবে কি করবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নাও। আমি পাশের রুমের আইনের এক ছাত্র যিয়া ভাইকে (বরিশাল) বিষয়টি বললাম। এরপর ঐ রাতেই হলে ওদের কয়েকজন লিডারের সাথে দেখা করলাম এবং ঘটনা যে ঘটিয়েছে তার নামও বললাম। তারা বলল, ঠিক আছে আপনি হলেই থাকেন, আমরা দেখছি। যাহোক আল্লাহ্র রহমতে আমাকে আর হলের বাইরে যেতে হয়নি। আমার কাজের গতি আরো বৃদ্ধি পেল। পরে অপরাধী আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়।

১৯৯২ সালের একটি ঘটনা। আমি তখন মাদারবখশ হলের ২১৪ নং কক্ষে থাকি। দীর্ঘদিন বন্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। শাহমাখদুম ট্রেনে এসে গভীর রাতে হলের গেটের সামনে আসতেই গেট থেকে আওয়াজ এল 'আপনি কে? আর এক পাও সামনে এগুবেন না, এগুলে ক্ষতি হবে'। গভীর অন্ধকার গেটের সামনে আলো নেই। আমি থমকে দাঁড়ালাম। ভাবলাম কে এবং কেন এমন বলল? চিন্তা করলাম সম্ভবত একদল হল দখল করে আছে। শত্রুপক্ষ যাতে হলে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তারা কড়া পাহারা বসিয়েছে। আমি পরিচয় দিয়ে দূর থেকেই বললাম, আমাকে হলে যেতে হবে ভাই। ওরা বলল, 'এখন ঢুকা যাবে না, স্টেশনে গিয়ে থাকেন'। আমি বললাম, 'স্টেশনে একাকী থাকতে পারব না'। ওদের একজন আবার কড়া ভাষায় বলল, 'আপনি দ্রুত চলে যান অসুবিধা হবে'। আমি তো নাছোড়বান্দা। বললাম, 'ভাই! আমাকে হলেই থাকতে হবে'। শেষে চাপা কণ্ঠে ওদের একজন বলল, 'আচ্ছা আপনি তাড়াতাড়ি গেটে প্রবেশ করুন'। আমি গেটে প্রবেশ করতেই দেখি একটি সশস্ত্র গ্রুপ অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং গেস্টরুমে অস্ত্র-বারুদের স্তূপ। জীবনে প্রথম এ দৃশ্য দেখা। হতোচকিত হয়ে ওদের দিকে তাকালাম। ওরা প্রায় সকলেই আমার পরিচিত। তারপর আমার রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। রুমের কাছে এসে দেখি বাড়িতে চাবি ফেলে এসেছি। হতাশ মনে চারিদিকে তাকালাম। মনে হল হলে এ গ্রুপটি ছাড়া তৃতীয় কোন প্রাণী দিলাম। পার্শ্বেই ওদের বড় লিডারের রুম। রুমে প্রবেশ করে সরলভাবেই তাদের রুমে থাকার প্রস্তাব দিলাম। ওরা বলল, 'না এ রুমে থাকা যাবে না, টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে'। দেখলাম, ঐ রুমটি তাদের অস্ত্রভাণ্ডার। পরে এক ক্যাডারের রুমে তারা আমার থাকার ব্যবস্থা করল। সারারাত বোমা ও গুলির শব্দে আর ঘুম আসে না। কখন বিতাড়িত শত্রু গ্রুপ ভিতরে প্রবেশ করবে সে আতংকে ঐ ভয়ংকর রাতটি পার করেছিলাম।

যাহোক পরবর্তীতে হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর আমরা হাদীছ ফাউন্ডেশনকে যুবসংঘ রাবির অফিস করে কার্যক্রম শুরু করি। ঐ সময়ে স্যার আমাকে তাঁর থিসিস, আর-রাহীকুল মাখতূম ও অন্যান্য বই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচার ও বিক্রয়ের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি রাবির প্রতিটি হল, বিভাগ, কেন্দ্রীয় মসজিদ ও লাইব্রেরীসহ পুরা ক্যাম্পাসে ব্যাপক প্রচার-প্রসারের চেষ্টা চালাই। একদিন আমার নতুন হল প্রাধ্যাক্ষকে থিসিস নেবার জন্য বললাম। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বললেন। আমি আব্দুর রবকে সাথে নিয়ে স্যারের বাসায় গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি না করে দিলেন এবং কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা বললেন। আমরা তাঁর আচরণে বিরক্ত ও মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লাম। রাগে কিছু কথাও বলে ফেলেছিলাম। উল্লেখ্য পরে মাস্টার্স পরীক্ষা শেষে সার্টিফিকেট নিতে যাই আমার হলে। হল কর্মকর্তা খাদেম ভাই বললেন, প্রভোষ্ট আপনার সার্টিফিকেট দিতে নিষেধ করেছেন। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন সার্টিফিকেটটি আমার খুব প্রয়োজন ছিল। পরদিন খাদেম ভাই অন্য এক স্যারকে ম্যানেজ করে আমার সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

আরেক দিনের ঘটনা- সব বিভাগ ও সেকশনে বই সরবরাহ করছি। এরই অংশ হিসাবে আরবী বিভাগে গেলাম। ভাবলাম স্যারের ডিপার্টমেন্টে যাই। যদি সেখানে তাঁর থিসিস না থাকে কেমন হবে? আবার ভাবি বর্তমান সভাপতি তো জমঈয়ত আহলেহাদীছের উর্ধ্বতন নেতা। তিনি কি অনুমতি দেবেন? মনে মনে বলি তাতে কী হয়েছে, আমার সাথে তো তাঁর ভাল পরিচয় আছে। তাছাড়া তিনি তো নিজের পকেটের টাকা দিয়ে কিনবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা দিয়ে কিনবেন। যাহোক সাহস করে সোজা চলে গেলাম সভাপতির রুমে। বেশ কয়েকজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে বসতে বললেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর তাঁরা জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার বল। বললাম, 'স্যার, গালিব স্যারের থিসিসটি আপনাদের ডিপার্টমেন্টে আছে কি? সভাপতি স্যার বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে স্যার ডিপার্টমেন্টে রাখার জন্য একটা দিতে চাই? বলার সাথে সাথে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। সকলে সমস্বরে বিভিন্ন কটুবাক্য ব্যবহার করলেন এবং আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি প্রয়োজনীয় জওয়াব দিয়ে মনের ব্যথা নিয়ে বিভাগীয় অফিস থেকে ফিরে এলাম। সেদিন সেখানে অনেক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষে কেউ কোন কথা বলেননি। মনে মনে ভাবলাম, গালিব স্যার এই মানুষগুলোর সাথে চাকুরী করেন কিভাবে? এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যুবসংঘে'র অধীনে থেকে দা'ওয়াতী কাজ করতে গিয়ে ছোট-বড় নানা সমস্যা, হুমকি-ধমকি, কখনও বা অপমানিত হ'তে হয়েছে। তবে মনের মাঝে একটা তৃপ্তি রয়েছে যে, দুনিয়াতে কিছু না পেলেও পরকালের খাতায় সম্ভবত কিছু পূণ্য জমা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমল-আক্বীদার পরিবর্তন হয়েছে 'যুবসংঘে'র এই দাওয়াতী কাফেলায় শরীক হবার পরই।

১৯৯৫ সালের আরেকটা ঘটনা। আমি তখন মাস্টার্স-এর ছাত্র। এ সময়ে নওদাপাড়া মাদরাসায় বেড়াতে আসি। সে সময় 'যুবসংঘে'র কয়েকজন ভাইয়ের সুপারিশে ড. গালিব স্যার আমাকে মাদরাসায় ক্লাস নেয়ার জন্য বলেন। পরিবারের অনুমতি নিয়ে ১৯৯৫ সালের ২৩ মে যোগদান করি নওদাপাড়া মাদরাসায়। ইতিপূর্বে স্যার আমাকে একটা গুরু দায়িত্ব দেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মাসিক পত্রিকা **'আত-তাহরীক'**-এর নিবন্ধন নেয়ার জন্য। প্রায় দুই বছর শত চেষ্টার মাধ্যমে রাজশাহী-ঢাকা নিয়মিত যাতায়াত অথবা পুলিশ-ডিসি নানা প্রশাসনিক অফিসে বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে অনেক সময় ব্যয় করে 'আত-তাহরীক' পত্রিকার ছাড়পত্র পাই। আজ সেই 'আত-তাহরীক'-এর নাম-ডাক, প্রচার-প্রসার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে *আল-হামদুলিল্লাহ*।

পরিশেষে আজকের এই সুভক্ষণে স্মরণ করতে চাই আমার সেসব সাথীভাইদের কথা যারা দায়িত্ব পালনকালে আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে এবং সংগঠনের অন্যান্য সাথী ও শুভাকাঙ্খী ভাইদেরকে যারা ঐ সময়ে দা'ওয়াতী কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তাদের কার্যক্রমকে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির অসীলা করে দিন! আমীন!!। সাথে সাথে অন্তরের অন্তস্তল থেকে আবারো স্মরণ করি সেই শফিক ভাইকে যিনি আমাকে পরম শ্রদ্ধাভাজন ড. গালিব স্যারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং আমাকে সঠিক পথে আসার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন!!

দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো যখন ধ্বংসাত্মক ছাত্র রাজনীতির অক্টোপাশে বন্দী। শিরক-বিদ'আত আর কুসংস্কারের ঘোর অমানিশা, দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের প্রতিযোগিতায় যখন হাবুডুবু খাচ্ছে ছাত্রসমাজ, তখন এ দেশের ছাত্র সমাজসহ দেশের আপামর জনগণকে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** ইসলামের সত্যিকার শান্তি ও মুক্তির পথ দেখিয়ে যাক এ প্রত্যাশাই করছি সর্বান্তকরণে। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন- আমীন!!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ: ফিরে দেখা *

১৯৭৮-১৯৭৯ সেশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'যুবসংঘ'-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠালাভের ৩ মাস পর রাবি আরবী বিভাগের তৎকালীন এম. এ শেষ বর্ষের ছাত্র জনাব ইউনুসুর রহমানকে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কর্ম পরিষদ গঠন করা হয়। 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের উপস্থিতিতে গঠনকৃত এই কমিটির মাধ্যমেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যুবসংঘ'-এর সর্বপ্রথম পদচারণা শুরু হয়। অত:পর প্রতি বছর নিয়মিত কর্মপরিষদ গঠনের মাধ্যমে 'যুবসংঘ'-এর কার্যক্রম এগিয়ে চলতে থাকে।

রাজশাহী বিভাগে আহলেহাদীছের আধিক্য বেশী থাকায় এ অঞ্চলের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আহলেহাদীছ আক্বীদার অনুসারী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। সে হিসাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যুবসংঘ'-এর জন্য সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ থাকার কথা ছিল অনুকূল। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, অস্ত্রনির্ভর ছাত্র রাজনীতির দৌরাত্মে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত ছাত্রসমাজের দুয়ারে পৌঁছানো দূরে থাক, স্বাভাবিক লেখাপড়ারও পরিবেশ এখানে ছিল না। তদূপরি শত প্রতিকূলতার মাঝেও আল্লাহর রহমতে পূঁজি করে 'যুবসংঘ'-এর ভাইগণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে সীমিত আকারে হলেও অব্যাহত রেখেছিলেন। বিশেষত: জনাব রফিকুল ইসলাম, শামসুল আলম, ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন, আকবার হুসাইন, ড. আতাউর রহমান প্রমূখ ভাইদের সুযোগ্য নেতৃত্বে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে 'যুবসংঘ' তার অগ্রযাত্রাকে সবসময়ই সচল রাখতে সমর্থ হয়েছিলো। ফালিল্লাহিল হামদ্। সাধারণত: কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হলের মসজিদই ছিল 'যুবসংঘ'-এর কার্যালয়। সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রোগ্রামগুলো মসজিদেই আয়োজিত হত। কাজলায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯৬ সালে এখানেই বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হয়। তখণ একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা প্রাপ্তি 'যুবসংঘ'-এর কার্যক্রমে সুশৃংখলতা ও গতিশীলতা নিয়ে আসে। শুরু হয় পরিকল্পিত কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ টি হলসহ পার্শ্ববর্তী কাজলা, তালাইমারী, বিনোদপুর, মির্জাপুর, মেহেরচন্ডি, বুধপাড়া ও বিআইটি (বর্তমান রুয়েট) প্রভৃতি স্থানে 'যুবসংঘ'-এর শাখা গঠিত হয়। হাদীছ ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক, মাসিক তাবলীগী ইজতেমাসহ প্রতিদিন বাদ এশা হাদীছ পাঠ করা হত। রামাযান মাসসহ নবীনবরণ, বিদায়ীদের সংবর্ধনা ইত্যাদি উপলক্ষে ব্যাপকাকারে প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হত। এসব অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছাস্বরূপ সাংগঠনিক বই-পত্র উপহার দেয়া হত। ১৯৯৭ সালে মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশের পর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অঙ্গনে তা প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। শিরকী ও বিদ'আতী কোন উপলক্ষ্য আসলে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মসজিদগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে 'যুবসংঘ'-এর কর্মীরা মুছল্লীদের মাঝে ফ্রি বই বিতরণ করত। এ নিয়ে একবার তুলকালাম ঘটনা ঘটে যায়। মুছল্লীরা এসব বই পড়ার পর ইমামদের প্রশ্ন করা শুরু করলে রাবি ইমাম পরিষদ ১৯৯৭ সালের ২৩ জুলাই এক মিটিং আহবান করেন। মতিহার হল মসজিদের পেশ ইমাম ও সেকশন অফিসার মাওলানা মো. আখতারুজ্জামান আনসারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মিটিং-এ আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ

---

* শামসুল আলম, আকবার হোসাইন ও আব্দুল হালীম- সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ। রাবি।

আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে তীব্র কটাক্ষ করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয় এবং এ সব তৎপরতা বন্ধের জন্য রীতিমত নিষেধাজ্ঞা জারী করে। এ মিটিং-এর সিদ্ধান্তসমূহ তারা উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রশাসনিক কার্যালয়ে প্রেরণ করে এবং প্রচারপত্র আকারে সাধারণ জনগণের মাঝে বিলি করে। যাহোক পরবর্তীতে যুবসংঘ, রাবির পক্ষ থেকে তাদের এ পদক্ষেপকে নিন্দা জানিয়ে কড়া জওয়াব প্রদান করা হলে বিষয়টি স্তিমিত হয়ে পড়ে।

'যুবসংঘ' ভর্তি পরিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্যও সাধ্যমত সহযোগিতা করেছে। আবাসন সুবিধাদান সহ সীটপ্লান প্রদান, পরবর্তীতে রেজাল্ট জানানো ইত্যাদি সেবামূলক কাজ 'যুবসংঘ'-এর কর্মীগণ নিয়মিতই করেছে। সংগঠনের পরিচিতি সম্প্রসারণের জন্য ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ব্যানার টাঙানো হত। রাবি পরিবহণসমূহে 'যুবসংঘ'-এর স্টিকার লাগানো, ওয়াল রাইটিং ইত্যাদি করা হত পর্যাপ্ত পরিমাণে।

২০০৪-২০০৫ সেশনের জন্য এইচ. এম. মুহসিনকে সভাপতি এবং মুহিব্বুর রহমান হেলালকে সাধারণ সম্পাদক করে কর্মপরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। এ সময় হাদীছ ফাউন্ডেশন কার্যালয় বেদখল হয়ে যাওয়ায় যুবসংঘের কার্যক্রমে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিছুটা ভাটা পড়ে যায় সাংগঠনিক তৎপরতায়। তদূপরি কার্যালয়ের অবর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে বৈঠকসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, প্রশাসনিক অফিসসহ প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে মাসিক আত-তাহরীক বিতরণ এবং সাধারণ ছাত্রদের মাঝে বই-প্রচারপত্র বিতরণের মত নিয়মিত কার্যক্রম যথারীতি পালিত হয়েছে।

অতঃপর ২০০৫-২০০৬ সেশনে মুহিব্বুর রহমান হেলালকে সভাপতি এবং আব্দুল হালীমকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী মিথ্যা জঙ্গীবাদের অপবাদে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ সংগঠনের ঊর্ধ্বতন ৪ জন নেতা গ্রেফতার হন। ডাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হন বিবেকবান শিক্ষকমণ্ডলীসহ সাধারণ ছাত্ররা। সরকারী বাধার কারণে মিছিল-সমাবেশের উদ্যোগ নিয়েও দীর্ঘ দুই মাস পর্যন্ত তা করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর ৩ মে' ০৫ রোজ মঙ্গলবার 'যুবসংঘ' রাবির পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসের বুকে আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হয় এবং এ জন্য ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অনুষদ বিল্ডিংসহ প্রতিটি হলে পোষ্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে শহীদুল্লাহ কলাভবনের সামনে ছাত্ররা একত্রিত হতে শুরু করলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মিছিলের ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধনভুক্ত সংগঠন নয় বলে 'যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে মিছিল করতে দেয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়। পরে সাধারণ ছাত্রদের পক্ষ থেকে মৌন মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়া হলে তাতেও বাধা দেওয়া হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেদিনের মত মিছিল-সমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করে যুবসংঘের রাবি প্রতিনিধিগণ প্রক্টরসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাদের নিদারুণ অসহযোগিতা ও শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবে এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে প্রকাশ্য মিছিলের ব্যাপারে আর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে এ সময় আমীরে জামা'আতের পক্ষে বিবৃতি গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও

সাধারণ শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে 'যুবসংঘ'-এর প্রতিনিধিদল যান এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের ব্রিফ করেন। এ সময় রাবি ভিসি ফাইসুল ইসলাম ফারুকীসহ প্রত্যেকেই সহানুভূতি প্রকাশ করলেও কেবল ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব ড. রূহুল আমীন ব্যতীত অন্য সকলেই পরিস্থিতির কারণে বিবৃতিদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে ১৭ আগস্টের দেশব্যাপী বোমা হামলার কারণে পরিস্থিতি আরো প্রতিকূলে চলে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যুবসংঘ'-এর কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তী বছর ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে 'যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে নিবন্ধনভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জমা দেয়া হয় এবং মিছিলের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়। অতঃপর ২৬ এপ্রিল'০৬ তৎকালীন প্রক্টর ড. এনামূল হক (মনোবিজ্ঞান বিভাগ) স্যারের আন্তরিকতায় সহজেই বিষয়টি সমাধান হয় এবং শহীদুল্লাহ কলাভবনের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে টেন্ট নির্ধারণসহ প্রতি মঙ্গলবার ১১ টা হতে ১১.৪৫ মি. পর্যন্ত মিছিল-সমাবেশের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই অনুমোদনের মাধ্যমে অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের মত যুবসংঘ স্বাধীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রসারের সুযোগ লাভ করে। ফালিল্লাহিল হামদ্। অনুমতি প্রাপ্তির পর ১৬ মে'০৬ সালে আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে আমরা পুনরায় মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে 'যুবসংঘ'-এর পক্ষ এটিই ছিল সর্বপ্রথম মিছিল। শতাধিক ছাত্রের সম্মিলিত 'সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর' ধ্বনিতে রাবির আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে ক্ষণিকের জন্য। লাইব্রেরীর সম্মুখে মিছিল পরবর্তী সমাবেশে সোচ্চার কণ্ঠে আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবী তোলেন রাবি নেতৃবৃন্দ। সফল এই প্রোগ্রামের পর পরবর্তীতে ১৬ জুলাই '০৬ এবং ৮ আগস্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে আরো দু'টি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। শেষোক্ত মিছিল শেষে তৎকালীন উপাচার্য জনাব ড. আলতাফ হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এছাড়া রামাযান মাসে কেন্দ্রীয় মসজিদে একটি বড় আকারে ছাত্রসমাবেশের আয়োজন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে দা'ওয়াতী প্রোগ্রামসমূহ নির্বিঘ্নে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় এ বছর।

অতঃপর ২০০৬-২০০৭ সেশনে আব্দুল হালীমকে সভাপতি এবং আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এছাড়া প্রথমবারের মত অনুষদভিত্তিকভাবে কলা ও বিজ্ঞান শাখা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। ১৯ ডিসেম্বর'০৬ সালে নবাগতদের জন্য স্বাগত মিছিল বের করা হয়। শিরক ও বিদ'আতমুক্ত জীবন গঠনের উদাত্ত আহবান জানিয়ে প্রকম্পিত করা এ মিছিলটি এ বছরে সম্ভবত সবচেয়ে বড় আকারের ছিল। শহীদুল্লাহ কলাভবন, মমতাজুদ্দীন কলাভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইনে গেটে দাওয়াতী আহবান সম্বলিত বড় আকারের ব্যানার টাঙ্গানো হয়েছিলো। এছাড়া সাধারণ দা'ওয়াতী প্রোগ্রাম, ভর্তি পরিক্ষার্থীদের আবাসন সহযোগিতাসহ সিট-প্লান দেয়া ও অন্যান্য সেবাদান কার্যক্রম নিয়মিতভাবেই পরিচালিত হয়েছে।

আহলেহাদীছ কে?

ইহা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী ব্যক্তির নাম।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিবেদন ২০০৮-২০০৯ইং

আব্দুর রশীদ *

গঠনতান্ত্রিক নিয়মে দু'বছর অন্তর ফেব্রুয়ারী মাসে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর নতুন সেশন শুরু হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করায় নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ৭/৮ মাস পর গত ৫/১১/২০০৮ইং তারিখ (২০০৮-২০০৯) সেশনের জন্য **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাবি শাখা পূনর্গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য জনাব ইমামুদ্দীন (এম.এ.আরবী বিভাগ) কে সভাপতি এবং আব্দুর রশীদ (বি.এ.অনার্স, ৪র্থ বর্ষ, আরবী বিভাগ)কে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট বর্তমান কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কমিটির বাকি সদস্যগণ হলেন আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (এম.এ. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ) সহ সভাপতি, মামুনুর রশীদ (বি.এ.অনার্স, ৩য় বর্ষ, পরিসংখ্যান বিভাগ) সাংগঠনিক সম্পাদক, গোলাম কিবরিয়া (বি.এ.অনার্স, ১ম বর্ষ, আরবী বিভাগ) অর্থ সম্পাদক, ওবাইদুল্লাহ (এম.এ.ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ) প্রশিক্ষন সম্পাদক, মুখতারুল ইসলাম (বি.এ.অনার্স, ৩য় বর্ষ, আরবী বিভাগ) প্রচার সম্পাদক, যিয়াউর রহমান (বি.এ.অনার্স, ৪র্থ বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ) সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এবং মেসবাহুল ইসলাম (বি. এ. অনার্স, ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ) দফতর সম্পাদক।

অতঃপর শুরু হয় এ সেশনে যুবসংঘের কর্মতৎপরতা। পরকালীন জবাবদিহিতাকে স্মরণ করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছাত্রদের মাঝে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য এ পরিষদ সাধ্যানুযায়ী কাজে আত্মনিয়োগ করে। নিম্নে এপরিষদের কর্ম তৎপরতার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ উল্লেখিত হল।

প্রচারঃ যুবসংঘ রাবি শাখা ও অনুষদভিত্তিক সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ এ পর্যন্ত দাওয়াতী কর্মসূচী বাস্তবায়নে যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করেছে। নিয়মিত মাসিক বৈঠক ছাড়াও বেশ কয়েকটি আম দা'ওয়াতী প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। রামাযান মাস উপলক্ষ্যে ২৭ আগস্ট'০৯ ইং তারিখে নগরীর 'সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্ট'-এ এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিন শতাধিক ছাত্রের উপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইনসহ গণ্যমান্য সুধীমন্ডলী।

এছাড়া পার্শ্ববর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর যুবসংঘের দায়িত্বশীল ও সাধারণ ছাত্রদেরকে নিয়ে জরুরী ও বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটসহ অন্যান্য গেট ও মধ্যবর্তী উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান লিখে ব্যানার টাঙ্গানো হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য সীটপ্লান দেয়া হয় এবং পরীক্ষার্থীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত যোগাযোগ, বই-পত্র বিলি, পরিচিত ক ও খ বিতরণ, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে রাবি-র ছাত্রদের মাঝে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌছানো হয়।

সংগঠনঃ- সাংগঠনিক মজবুতির জন্য রাবি শাখা ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে অনুষদভিত্তিক শাখা মাত্র দু'টি ছিল। এ সেশনে অনুষদভিত্তিক আরো ৩টি শাখা গঠন করা হয় এবং সকল অনুষদের দায়িত্বশীলদের নিয়ে নতুন আঙ্গিকে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়।

---

* সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহরেহাদীছ যুবসযঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নিম্নে সাংগঠনিক অনুষদ সমূহ এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের নাম ও পদবী উল্লেখ করা হলঃ

ক্রঃ নং	নাম	শাখার নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সাংগঠনিক মান	দায়িত্ব
১	আব্দুছ ছবুর	কলা অনুষদ	এম.এ(শেষবর্ষ), আরবী বিভাগ	কর্মী	সভাপতি
২	শফীকুল ইসলাম	ঐ	বি.এ.অনার্স(৪র্থ বর্ষ), আরবী বিভাগ	কর্মী	সাধারণ সম্পাদক
৩	আব্দুল মান্নান	জীব ও ভূ-বিজ্ঞান	বি.এস.সি (৩য় বর্ষ) উদ্ভিদবিজ্ঞান	কর্মী	সভাপতি
৪	মুশতাক আহমাদ (পলাশ)	ঐ	বি.এস.সি (৩য় বর্ষ) ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা	প্রাথমিক সদস্য	সাধারণ সম্পাদক
৫	তাওহীদুল ইসলাম	সমাজবিজ্ঞান	বি.এস. এস (৪র্থ বর্ষ) অর্থনীতি	প্রাথমিক সদস্য	সভাপতি
৬	মামুনুর রশীদ	ঐ	বি.এস. এস (২য় বর্ষ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান	কর্মী	সাধারণ সম্পাদক
৭	মইদুর রহমান	বিজ্ঞান	বি.এস. সি (৩য় বর্ষ) রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান	প্রাথমিক সদস্য	সভাপতি
৮	আরীফুর রহমান	ঐ	বি.এস. সি (৩য় বর্ষ) পদার্থবিজ্ঞান	প্রাথমিক সদস্য	সাধারণ সম্পাদক
৯	আব্দুল গনী	বিজনেস স্টাডিজ ও আইন অনুষদ	এল.এল. বি (১ম বর্ষ) আইন ও বিচার বিভাগ	কর্মী	সভাপতি
১০	মাহমুদুল হাসান	ঐ	বি.বি. এ (১ম বর্ষ) ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ	প্রাথমিক সদস্য	সাধারণ সম্পাদক

প্রতি সেশনের ন্যায় এ সেশনেও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাবি শাখা সকল অপসংস্কৃতির চর্চা ও ইসলাম বিরোধী কর্মতৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়। তন্মধ্যে ২০০৮-২০০৯ ইং সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা ছাত্র ভর্তি বাধাগ্রস্থ করা, সংস্কৃতির নামে হজ্জ ক্যাম্পের সামনে লালন শাহের ভাষ্কর্য প্রতিষ্ঠা ও রাবিতে নাট্য সংগঠন উদীচী কর্তৃক পরিচালিত 'মান্দার' নাটকে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর নামকে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন এবং সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৬ নভেম্বর'০৮ ইং তারিখে আরবী বিভাগের শিক্ষক জনাব ইফতেখারে আলম মাসউদ-এর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য বিদেশ গমনকে কেন্দ্র করে 'যুবসংঘ'-রাবি শাখা ও জমঈয়তে শুববানে আহলেহাদীছ রাবি শাখা একই মঞ্চে বিদায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে চমৎকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। যেখানে উভয় সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া-লেখার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এ সংগঠন বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকটে নানা মতামত ও সুপরামর্শ প্রদান করে থাকে।

প্রশিক্ষণঃ 'যুবসংঘ' রাবি শাখা বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। যা নিম্নে প্রদত্ত হল:

সর্বস্তরের কর্মী, ছাত্র ও দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ:

চলতি সেশনের কর্মপরিষদ গঠনের পরপরই গত ১৩/১১/০৮ ইং তারিখ সর্বস্তরের কর্মী, ছাত্র ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীলদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা ছাড়াও বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ইসলামী দল ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য যে 'তাক্বলীদে শাখছী' বা 'অন্ধ ব্যক্তিপূজা' সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ভময় আলোচনা করা হয়। ফলে দায়িত্বশীল ও ছাত্রদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার হয়।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও **আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সাথে যুবসংঘ রাবি শাখা ও তার উপশাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে এ সেশনে বেশ কয়েকটি বৈঠক আয়োজনের সুযোগ হয় এবং সর্বস্তরের ছাত্রদের নিয়েও বিশেষ প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সকল বৈঠক ও প্রশিক্ষণে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ভময় আলোচনা করেন। ফলে দায়িত্বশীল ও সর্বস্তরের কর্মীরা নববলে বলীয়ান হয়ে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করেন।

এছাড়া দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত (২৭ মার্চ'০৯ ইং ও ৩ জুলাই'০৯ ইং) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও কর্মী মানোন্নয়ন পরীক্ষায় রাবি 'যুবসংঘ'-এর ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে রাবিতে **'যুবসংঘ'**-এর কেন্দ্রীয় অনুমোদিত কর্মী সংখ্যা ৪৪ জন এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা ৭ জন।

প্রকাশনাঃ ইতিপূর্বে প্রকাশনা জগতে **'যুবসংঘ'** রাবি শাখা গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম না হ'লেও সাময়িক কিছু লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি প্রকাশ করে। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যুবসংঘ'-এর কর্মতৎপরতার বিবরণ তুলে ধরতে চলতি সেশনে প্রথমবারের মত **'স্মরণিকা ২০১০ ইং'** প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষা সফরঃ ছাত্রসমাজের জ্ঞানের বিকাশ সাধন ও পারস্পরিক বোঝাপড়াকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে **'যুবসংঘ'** রাবি শাখা এ সেশনে দু'টি শিক্ষা সফরের আয়োজন করে। যার প্রথমটি ছিল বাংলার বুকে আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা কর্তৃক প্রদত্ত বুখারী শরীফের দারস প্রদানের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান ও বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও-এ এবং দ্বিতীয়টি ছিল বিশ্বের অন্যতম সৌন্দর্য্যের আঁধার সুন্দরবন, মংলা সামুদ্রিক বন্দর ও বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদে।

পরিশেষে বলা যায় যে, **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** রাবি শাখা সীমিত সামর্থের মধ্যেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের লক্ষ্যে দা'ওয়াত ও তাবলীগের বলিষ্ঠ কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। এভাবে সাংগঠনিক ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে এদেশে অহিভিত্তিক তাক্বওয়াপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে *ইনশা'আল্লাহ*। আল্লাহ আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং আমাদের এ সামান্য খিদমতটুকুর বিনিময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হেদায়েতের পথকে সুগম করে দিন। আমীন!!!

শিক্ষা সফর

*-গোলাম কিবরিয়া**

শিক্ষা সফর ২০০৯ :

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এ শিক্ষা অর্জিত হয় প্রধানত দু'টি পদ্ধতিতে একটি পঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, অপরটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ভ্রমণ হল এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির অন্তর্ভূক্ত। মহান আল্লাহ বলেন 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর এবং দেখ তিনি কিভাবে সৃষ্টি কর্ম শুরু করেছেন' (*আনকাবুত -২০*)। বস্তুতঃ ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভান্ডার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে সমৃদ্ধ হয়। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিজেদের জ্ঞানের সমৃদ্ধি সাধন এবং পারস্পরিক অনুভূতি বিনিময়ের এক অনুপম সুযোগ হিসাবে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ রাবি** শাখা গতবছর ৮ মার্চ তারিখ বাংলার বুকে আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা কর্তৃক সর্বপ্রথম বুখারী শরীফের দারস প্রদানের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান ও বাংলার প্রাচীন রাজধানী 'সোনারগাঁও'-এ শিক্ষা সফরের আয়োজন করে। গাড়ী ছাড়ার পূর্বমূহূর্তে **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের** প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সফরকারী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও দিকনির্দেশনা সম্বলিত এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করেন।

এই সফরে আমাদের সফর সঙ্গী ছিলেন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'**-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই। রাবি শাখার সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াসও ছিলেন আমাদের সফরসঙ্গী।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর পরই সফরের দো'আ পাঠের মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। মধ্যরাতের নীরবতা ভেঙ্গে আমাদের গাড়ী ছুটে চলল গন্তব্যস্থল বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও-এর উদ্দেশ্যে। ভোরের আলো ফোটার পূর্বক্ষণে রাজধানী ঢাকা এসে পৌছলাম। ফজরের ছালাত ও নাস্তার পর সকাল ৮ টার দিকে পৌঁছে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাবি 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও সেক্রেটারী সেখানে আমাদের স্বাগত জানালেন। সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন শেষে ঢাবি থেকে আমরা সোনারগাঁও-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং বেলা ১২টা নাগাদ সেখানে পৌঁছে গেলাম।

ঢাকা থেকে মাত্র ২৬ কিঃ মিঃ দুরত্বে অবস্থিত সোনারগাঁও। ঈশা খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয়। এখানে হোসেন শাহ নির্মিত একটি অতিসুন্দর মসজিদ আছে। আছে জয়নুল লোকশিল্প যাদুঘর ও বহুগ্রন্থে সমৃদ্ধ বিশাল লাইব্রেরী। ঈশা খাঁর রাজধানী তথা এই সোনারগাঁও-এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল পানাম সিটি, যেখানে বসে তিনি তার বিশাল জমিদারী পরিচালনা করতেন। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পানাম সিটির ভবনগুলো অনেকটাই সুরক্ষিত রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক এ সুদৃশ্য ভবনগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তারপর সেখান থেকে কয়েক মাইল দুরে অবস্থিত খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার স্মৃতি বিজড়িত স্থানে যাত্রা করলাম। ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম শরীফ তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর (১২৬৮-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) যাবত ছহীহায়নের দরস দানের ফলে দেশ-বিদেশের অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। আমরা সেখানে সবুজ গাছপালার ছায়ায় সারিবদ্ধ ছয়টি কবর দেখলাম। তার মধ্যে পাঁচটি সাদা আর একটি সবুজ রং দ্বারা আবৃত। সবুজ কবরটির গায়ে খোদায় করে লেখা 'শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী'। ফলে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারলাম যে, এটিই ছহীহ হাদীছের ঝাণ্ডাবাহী নির্ভীক মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার কবর। কিছু আঁকা বাঁকা গলি অতিক্রম করে আমরা পৌঁছলাম তাঁর কুতুবখানায়। যা এখন প্রাচীন স্থাপত্য মাত্র।

অতঃপর আমরা সেখান থেকে পড়ন্ত বিকালে রওয়ানা দিলাম নবনির্মিত বাংলার তাজমহলের দিকে এবং সন্ধ্যালগ্নে সূর্য প্রায় ডুবো ডুবো অবস্থায় সেখানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে মাগরিবের ছালাত আদায়ের পর আমরা রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা শুরু করলাম। ফেরার পথে শিক্ষা সফর আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় আকর্ষনীয় এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। পরিশেষে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা রাত্রির শেষভাগে এসে পৌঁছে যাই রাজশাহীতে।

---

* অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা সফর ২০১০

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাবি শাখা গত বছরের ন্যায় এ বছরের ৮ ফেব্রুয়ারী আয়োজন করে শিক্ষা সফর ২০১০-এর। এবারের সফরের স্থান নির্ধারিত হয় বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, মংলাপোর্ট ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন। গতবারের ন্যায় এবারও আমরা প্রায় ৬০ সদস্যেরও অধিক সফরসঙ্গী নিয়ে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** এর কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' হ'তে যাত্রা শুরু করি। আমাদের যাত্রা শুরুর পূর্বমুহূর্তে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সফরকারীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও সফরের দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য যেন হয় আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ। তোমরা সর্বাবস্থায় সত্য-ন্যায়ের আদর্শের উপর অবিচল থাকবে। আর বাতিলের বিরুদ্ধে থাকবে আপোষহীন'। গাড়ী ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাথে থেকে আমাদেরকে বিদায় জানান। এবার আমাদের সফরসঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন ভাইকে। সফরের দো'আ পাঠের মাধ্যমে রাত্রি ১০টার দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। ফযরের ছালাতের পূর্বেই আমরা খুলনার ঐতিহাসিক রূপসা সেতু পেরিয়ে বাগেরহাটে অবস্থিত কালদিয়া আহলেহাদীছ মাদরাসায় পৌঁছে যাই। সেখানে ফজরের ছালাত আদায়ের পর মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলী আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে নাস্তা সেরে নিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করি। অতঃপর পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে গড়ে উঠা খানজাহান আলীর মাজারে পৌঁছলাম। দক্ষিণবঙ্গে তিনিই ইসলামের প্রাথমিক প্রচারাভিযান নিয়ে এসেছিলেন। আমরা খান জাহান আলীর মাজারে প্রবেশ করে ঘুরে দেখলাম। পার্শ্বেই বিশাল দীঘি। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খান জাহান আলী এ এলাকার লোকদের পানি পানের সুবিধার্থে দীঘিটি খনন করেছিলেন। এখানে রয়েছে বিশাল আকারের কুমির। বিভিন্ন স্থান হতে আগত লোকেরা রোগমুক্তি ও সমস্যা সমাধানের আশায় এই মাজারে ও কুমিরকে ডিম, মুরগী, খাসী, গরু, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মানত করে যাচ্ছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যিনি এসেছিলেন এদেশের পথভোলা মানুষকে ইসলামের সরল-সঠিক পথ দেখানোর জন্য অথচ আজ তাঁর কবরকে মাজার বানিয়ে একদল লোক শিরক, বিদ'আত সহ অসংখ্য অনৈসলামিক কার্যকলাপের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করছে। খানজাহান আলী ইসলাম প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, জলাশয়, রাস্তা-ঘাট ও দালান-কোঠা নির্মাণ করে শহরটিকে সাজিয়ে তুলেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদটি। মাজার পরিদর্শন শেষে আমরা চলে গেলাম ঐ মসজিদে। দেখলাম মসজিদের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উঁচু প্রাচীর পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের ভিতরে রয়েছে একটি যাদুঘর, পিকনিক স্পট এবং বিশালায়তন এক দীঘি।

১৪৪০ সালে নির্মিত এই মসজিদটির চারদিকে রয়েছে সমুদ্র তীরবর্তী নিচু এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ শোভা। এটি ষাট গম্বুজ মসজিদ নামে খ্যাতি লাভ করলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ থেকে পূর্বেই শুনেছিলাম যে, তাতে ৭৭টি গম্বুজ রয়েছে। তাই কৌতুহল বশতঃ সেই গম্বুজগুলি গণনার জন্য মসজিদের পার্শ্বের এক্ব বড় কড়ই গাছে উঠে আমরা গম্বুজগুলি গণনা করে দেখলাম যে, তাতে ৭৭টি গম্বুজই রয়েছে। মূলতঃ মসজিদটির পিলারের সংখ্যা ৬০টি। সেখান থেকেই এ নামের উৎপত্তি। লোক মুখে জানা গেল খান জাহান আলী মসজিদটি তাঁর বিচারকার্য পরিচালনার জন্যও ব্যবহার করতেন। অতঃপর বেলা ১০টার দিকে আমরা রওয়ানা দিলাম সমুদ্রবন্দর মংলাপোর্ট এর উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে আমরা জাহাজ খালাসের দৃশ্য দেখলাম।

তারপর বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ একটি ট্রলার ভাড়া করে পশুর নদীর তীর ঘেষে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। দীর্ঘ নদীপথ অতিক্রম করে এক সময় আমরা পৌঁছে গেলাম সুন্দরবন। সেখানে পৌঁছানোর পর হেটে হেটে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, ধুন্দল ও পশুর সহ আরোও অনেক প্রজাতির গাছ-পালার সমারোহে গড়ে উঠা সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পেলাম। বনবিভাগের তৈরীকৃত দীর্ঘ রাস্তায় হাটতে হাটতে সুন্দরবনের অনেক ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলাম অভয়ারণ্যে রক্ষিত হরিণ, বানর ও কুমির সহ নানা প্রজাতির জীব-জন্তু। সুন্দরবনের এই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল। অবশেষে আমরা ট্রলার যোগে পুণরায় মংলা বন্দর ফিরে এলাম এবং দুপুরের খাবার শেষে যোহর ও আছরের ছালাত আদায় করে পার্শ্বেই অবস্থিত মেঘনা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করলাম। এখানে কর্মরত দু'জন কর্মচারী আমাদেরকে সম্পূর্ণ ফ্যাক্টরী প্রদক্ষিণ করালেন এবং সিমেন্ট তৈরীর জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালসহ কিভাবে তা প্রস্তুত করা হয় তার যাবতীয় তথ্যও প্রদান করেন। পরিশেষে তাদেরকে সংগঠনের কিছু বই-পুস্তক ও তাবলীগী ইজতেমা ২০১০ এর দা'ওয়াত দিয়ে বিদায় নিলাম।

অবশেষে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে যশোর এসে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করলাম। এখানে আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করছিলেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব আকবর হুসাইন। তিনি আমাদের দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিলেন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম এবং মধ্যরাতে এসে পৌঁছলাম। *ফালিল্লাহিল হামদ!*

যুবসংঘ

রাশিদুল ইসলাম
বি.এ. (অনার্স), ৩য় বর্ষ,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রা.বি

যুবসংঘ!
তুমি ৭৮-এর সিংহবেশীর সংগ্রামী এক চেতনা
তুমি দিশেহারা শত-সহস্র যুবকের সঠিক পথের দিশারা।
তুমি ৮০-র দশকের শিরক-বিদআতীর হৃদয় জ্বালানো অগ্নিশিখা
তুমি ঢাকার রাজপথে সাজ্জাদ ও কাশেমের রক্ত প্রবাহের ঘটনা।
তুমি ৮১-র দশকে গঠন করিলে আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা
তাইতো তোমার প্রচেষ্টায় মা-বোন পেল দ্বীনের সঠিক দিশা ॥

যুবসংঘ!
তুমি ৮৯-এর বিদ্বেষীদের বিষোদগারের নিশানা
তুমি ফয়েযুল, কবীর আর রুস্তম আলীর সংগ্রামী বাসনা।
তুমি ৯০ দশকের যুবসমাজের দৃঢ় ঈমানী পরীক্ষা
তুমি ৯৪-এর আবাল-বৃদ্ধের সাংগঠনিক চেতনা।
তুমি ৯৭-এর ভণ্ড ইমামের হৃদয়ের বিষজ্বালা
তাইতো তোমার সব তৎপরতায় নিষেধাজ্ঞারোপ করে তারা ॥

যুবসংঘ!
তুমি ২০০১-এর অর্থলিপ্সুর পথের বড় বাধা
তাইতো সে তোমার ধ্বংস কামনায় জাগ্রত ছিল সদা।
তুমি নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার-প্রসারে নির্ভীক এক সেনা
২০০৫-এর ফেব্রুয়ারীতে তাই ঘটে গেল স্মরণীয় এক দুর্ঘটনা।
তুমি ২০০৯-এর সংস্কারপন্থীর যন্ত্রণাদায়ক কাটা
অথচ তুমি এগিয়ে চলেছ আসুক না যতই বাধা ॥

স্মরনিকা

-মুহাম্মাদ মইদুর রহমান (স্বপন)
৩য় বর্ষ, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

স্মরণিকা,
তুমি ফেলে আসা অতীত কর্মকাণ্ডের স্মৃতি
তুমি ভবিষ্যতের কর্মপন্থার উৎসাহী উদ্দীপ্তি ।
তুমি বর্তমান কর্মতৎপরতার উজ্জ্বল এক নক্ষত্র
তুমি শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে অদম্য অস্ত্র ।
তুমি অগ্নিপথে ছুটে চলা শীতলযান
তুমি বাতিলের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম ।
তুমি ভূ-পৃষ্ঠে ছুটে চলা দুঃসাহসী যাত্রী
তুমি বিদ্যানিকেতনের অপসংস্কৃতি রোধের দিশারী ।
তুমি কলমী জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুপ্রেরণা
তুমি কুসংস্কারের মুলোৎপাটনে সংগ্রামী চেতনা ।

আহলেহাদীছ সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য

১. ইমাম বুখারী-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) নাজী ফের্কা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'উক্ত দল হ'ল 'আহলুল হাদীছ জামা'আত'। যারা রাসূলের বিধান সমূহের হেফাযত করে ও তাঁর ইল্ম কুরআন ও হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। নইলে মু'তাযিলা, রাফেযী (শী'আ), জাহ্মিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না। বিশ্বপ্রভু এই বিজয়ী দলকে দ্বীনের পাহারদার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন এবং ছাহাবা ও তাবেঈনের সনিষ্ঠ অনুসারী হবার কারণে তাদেরকে হঠকারীদের চক্রান্তসমূহ হ'তে রক্ষা করেছেন।.... এরাই হ'লেন আল্লাহ্র সেনাবাহিনী। নিশ্চয় আল্লাহ্র সেনাদলই হ'ল সফলকাম'। *(শারফু আছহাবিল হাদীছ ৫)।*

২. ইয়াযীদ ইবনে হারূণ (১১৮-২১৭ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন, 'তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৩-এর ব্যাখা; ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬ হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছহীহা হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা; শারফ ১৫)।*

৩. ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'আহলেহাদীছের চেয়ে উত্তম কোন দল আমার কাছে নেই । তারা হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু চেনেন না' *(আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৭)।*

৪. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন, 'যখন আমি কোন আহলেহাদীছকে দেখি, তখন আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জীবন্ত দেখি' *(শারফ ২৬)।*

৫. খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন, 'নাজী দল হ'ল আহলেহাদীছ।.... ' লোকদের মধ্যে তারাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়' *(শারফ ১৫, ৩৩)।*

৬. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য আবু ইউসূফ (১১৩-১৮২ হিঃ) একদা তাঁর দরবার সম্মুখে কতিপয় আহলেহাদীছকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে আপনাদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই' *(শারফ ২৮)।*

৭. আহমাদ ইবনু সারীহ বলতেন, 'দলীলের উপরে কায়েম থাকার কারণে আহলেহাদীছগণের মর্যাদা ফক্বীহগণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে' *(আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী ঃ ১২৮৬ হিঃ, ১/৬২ পৃঃ।*

৮. ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেন, 'আহলেহাদীছ যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত' *(শারফ ২৯ পৃঃ)।*

৯. ওছমান ইবনু আবী শায়বা একদা কয়েকজন আহলেহাদীছকে হয়রান অবস্থায় দেখে মন্তব্য করেন যে, 'আহলেহাদীছের একজন ফাসিক্ব ব্যক্তি অন্য দলের একজন আবিদের চেয়েও উত্তম' *(শারফ ২৭ পৃঃ)।*

১০. খলীফা হারূনুর রশীদ (মৃঃ ১৯৩ হিঃ) বলতেন, 'আমি মুসলমানদের চারটি দলের মধ্যে চারটি বস্তু পেয়েছিঃ (ক) কুফরী সন্ধান করে পেয়েছি 'জাহমিয়া' (অদৃষ্টবাদী)-দের মধ্যে (খ) কূটতর্ক ও ঝগড়া পেয়েছি মু'তাযিলাদের মধ্যে (গ) মিথ্যা খুঁজেছি ও সেটি পেয়েছি 'রাফেযী' (শী'আ)-দের মধ্যে (ঘ) আমি 'হক্ব' খুঁজেছি এবং তা পেয়েছি 'আহলেহাদীছ'দের মধ্যে' *(শারফ ৩১ পৃঃ)।*

১১. 'বড় পীর' বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জীলানী আল-বাগদাদী (৪৭০-৫৬১ হিঃ) 'নাজী' দল হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম'আতের বর্ণনা দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়।

বিদ'আতীদের লক্ষণ হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। এগুলি সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামী ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আহলুল হাদীছ'। বিদ'আতীদের এই সব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না *(আব্দুল ক্বাদির জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতত ত্বালেবীন (মিসর ঃ ১৩৪৬ হিঃ) ১/৯০ পৃঃ।*

১২. আহমাদ ইবনু সিনান আল-ক্বাত্বান (মৃঃ ২৫৯ হিঃ) বলেন, 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে, তখন তার অন্তর থেকে হাদীছের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়' *(আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ (কুয়েতঃ দারুস সালাফিইয়াহ ১৪০৪ হিঃ), পৃঃ ১০২।*

১৩. ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন, 'যার কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার এটা জানা কথা যে, আহলেহাদীছগণ হ'লেন, মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীসমূহের ও তাঁর ইলমের অধিক সন্ধানী ও সে সবের অনুসরণের প্রতি অধিক আগ্রহশীল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ হ'তে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী, যার বিরোধিতা সে করে থাকে।..... মুসলমানদের মধ্যে তাদের অবস্থান এমন মর্যাদাপূর্ণ, যেমন সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান' *(আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মিনহাজুস্ সুন্নাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ২/১৭৯ পৃঃ।*

১৪. ছহীহ মুসলিম-এর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু শারফ নববী আশ-শামী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন, এই ফের্কা মুমিনদের মধ্যকার বীর মুজাহিদ, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, যাহিদ (দুনিয়া থেকে নির্লিপ্ত ইবাদতকারী), নেকীর কাজের আদেশ দানকারী ও অন্যায় কাজের নিষেধকারী বিভিন্ন পর্যায়ের মুমিন হ'তে পারেন, যারা আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা দান করে থাকেন। এদের সবাইকে একস্থানে জমায়েত থাকা আবশ্যক নয়। বরং তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকতে পারেন' *(মুসলিম শরহ নববী (দেউবন্দ ছাপা) ২/১৪৩ পৃঃ; ফাৎহুল বারী ১/১৯৮ হা/৭১-এর ব্যাখ্যা, 'ইলম' অধ্যায়।*

১৫. হাফেয ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) 'যেদিন আমরা ডাকব প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ' *(ইসরা ৭১)* আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বীয় জগদ্বিখ্যাত তাফসীরে বিগত একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, 'আহলেহাদীছদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা যে, তাদের একমাত্র ইমাম হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর (বৈরুতঃ ১৪০৮/১৯৮৮) সূরা বণী ইসরাঈল ৭১ আয়াতের ব্যাখ্যা, ৩/৫৬ পৃঃ।)* তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের ইমামের নামে ডাকা হবে।

১৬. শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুক্তিরপ্রাপ্ত সেই কাফেলা হ'ল আহলেহাদীছগণ (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সাথে একত্রিত করুন!), যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির রায়কে প্রাধান্য দেন না, যত বড়ই তিনি হউন না কেন। তারা তাদের বিরোধী। তারা যেমন কেবল তাদের ইমামদের রায়কে প্রাধান্য দেয়- অথচ তাদের ইমামগণ এ থেকে নিষেধ করে গেছেন, তেমনি আহলেহাদীছগণ একমাত্র তাদের নবীর কথাকে প্রাধান্য দেন'। এই বর্ণনার পর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আহলেহাদীছরাই সেই বিজয়ী কাফেলা এবং নাজাতপ্রাপ্ত দল; বরং শ্রেষ্ঠ উম্মত, যারা মানবজাতির উপর হবে সাক্ষী স্বরূপ। *(সিলসিলা ছহীহাহ ১/৪৮২ পৃঃ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা)।*

এক নযরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী শহর থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্বে, রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের বাম পাশে মতিহারের সবুজ চত্বরে প্রায় ৩০০ হেক্টর জমির উপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। রাজশাহীর সর্বস্তরের মানুষের দাবী ও আন্দোলনের ফসল হিসাবে ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৫৩' পাশ হয়। একই বছরের ৬ জুলাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. ইতরাৎ হোসেন জুবেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নির্বাচিত হন। অতঃপর তৎকালীন এম.এল.এ, রাজশাহীর বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব মাদার বখ্‌শ ও ড. জুবেরীকে যুগ্ম-সম্পাদক করে ৬৪ সদস্যবিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়। তাঁদের নেতৃত্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার খসড়া রচিত হয়।

বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবর্ষে। শুরুতে দর্শন, ইতিহাস, বাংলা, ইংরেজী ও গণিত বিষয়গুলোতে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু হয়। ১৯৬২ থেকে শুরু হয় অনার্স কোর্স। সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে শহরের বিভিন্ন বাড়িতে নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসসমূহ স্থাপন করা হয়। শহরের একপাশে পদ্মা নদীর তীরে ঐতিহাসিক 'বড়কুঠি'তে উপাচার্যের বাসভবন ও কার্যালয় স্থাপন করা হয়। ক্লাশ নেওয়া হত রাজশাহী কলেজে। রাজশাহী কলেজ সংলগ্ন ফুলার হোস্টেলকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে পরিণত করা হয়। বড়কুঠিপাড়ার 'লালকুটি" ভবনে স্থাপিত হয়েছিল ছাত্রীনিবাস। শহরস্থ বি,বি, হিন্দু একাডেমিতে স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শিক্ষক লাউঞ্জ এবং চিকিৎসা কেন্দ্র। ১৯৫৮ থেকে বর্তমান ক্যাম্পাসে দালান-কোঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৬৪ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিস ও বিভাগ মতিহার ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি অনুষদের আওতায় ৪৭টি বিভাগে ৪৯টি বিষয় রয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসা অনুষদের আওতায় অধিভুক্ত কলেজসমূহে এম. বি. বি. এস, বি. ডি. এস কোর্স চালু আছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে ৪ বৎসরের অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। সনাতন পদ্ধতির শ্রেণীভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে চালু হয়েছে আধুনিক গ্রেডিং পদ্ধতি। সময়ের চাহিদা বিবেচনা করে একাধিক অনুষদে ইতোমধ্যে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ ও ইনস্টিটিউট ক্রমে কম্পিউটারাইজড্ হচ্ছে। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বহির্বিশ্বের সাথে যোগযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিটি অনুষদের স্বতন্ত্র কম্পিউটার সেল ও ল্যাব রয়েছে, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ ইন্টারনেটসহ অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় আবাসিক সুবিধা অপ্রতুল। এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউ-এর অধীনে রাবি স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বধানে আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি চিন্তা করে ইতিমধ্যে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৯০-এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবুজ বনায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমে অব্যবহৃত ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষ রোপনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে চলতি মৌসুমে প্রায় সাড়ে ছ'শ আমগাছ রোপনের কাজ সম্পন্ন হবে।

১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর দেশের সবচেয়ে প্রাচীন সংগ্রহশালা। যা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি অংশ।

****

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বইসমূহ

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১।	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০২।	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৩।	জাগরণী ১ম খণ্ড	আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী
০৪।	জাগরণী ২য় খণ্ড	আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী
০৫।	মাসায়েলে কুরবানী	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৬।	শবেবরাত	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৭।	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৮।	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৯।	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১০।	হজ্জ ও ওমরাহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১১।	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১২।	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৩।	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৪।	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৫।	আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী	মাওলানা আহমাদ আলী
১৬।	কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল	মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল আলী
১৭।	ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৮।	ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৯।	হাদীছের প্রামাণিকতা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২০।	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২১।	তিনটি মতবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২২।	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৩।	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৪।	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৫।	একটি পত্রের জওয়াব	আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
২৬।	ইনসানে কামেল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৭।	সূদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
২৮।	ছবি ও মূর্তি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৯।	ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ	ডঃ নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর

- ইমাম আবুদাউদ মুক্তি প্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেন, (২০২-২৭৫ হিঃ) 'আহলেহাদীছরা যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত' (শারফু আছহাবিল হাদীছ, ২৯ পৃঃ)।

- হে তরুণ ছাত্র সমাজ! ক্লান্তিহীন চেতনায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলো মহা সত্যের সন্ধানে।